আমার কন্যা সংঘমিত্রাকে



GOURKANYA
by BEDOUIN
PRICE Rs. 3.50

Publishers :
EASTLIGHT BOOK HOUSE
20, STRAND ROAD,
CALCUTTA-1

এই লেখকের অন্যান্য বই :

বাদশা-বেগম-নফর

এই শহরে

পথে প্রান্তরে ১ম পর্ব

পথে প্রান্তরে ২য় পর্ব

যশাই তলার ঘাট

কোন এক রাতে

রূপোতি

কবি কংক (রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত)

পথ আমায় ডাকে (যন্ত্রস্থঃ)

॥ ১ ॥

দুই বোন।

মহানন্দা আর কালিন্দী।

মহানন্দা রূপসী, স্ফীতোদরা, খরতোয়া। কালিন্দী ধূসরাঙ্গী, লক্ষ্যহীনা, ক্ষীণতোয়া।

পুরাতন শহরের কিনারায় দুই বোনের দেখা। বহুকাল অদর্শনের পর হঠাৎ যেন দেখা হয়েছে। ক্ষীণতোয়া কালিন্দী উচ্ছ্বাসে আঁকড়ে ধরেছে শুভ্রাঙ্গী হিমকণাবাহী মহানন্দাকে। কলকণ্ঠের আনন্দোচ্ছল সম্ভাষণে কল-কল ছল-ছল করে উঠেছে দুইজনায়।

মহানন্দার কোলে ধীরে ধীরে কালিন্দী মুখ লুকিয়েছে, স্বীয় নামের অপযশ থেকে আত্মরক্ষা করেছে। গঙ্গার কোল কেটে আধা বালুচরার বুক বেয়ে দুরন্ত গতিতে ছুটে আসতে আসতে কোথায় যেন কি হয়ে গেছে, সর্পিল গতিকে সহজ করে মহানন্দায় লীন হয়েছে কালিন্দী।

বর্ষায় বুক ফুলে ওঠে কালিন্দীর, কূল ভেঙ্গে পড়ে দুদিককার। কিনারার মানুষ ছুটে পালায় নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে। মহানন্দার কাঁচের মত জল ঘোলা হয়ে ওঠে। কালিন্দীর কালিমায় মহানন্দা ডুকরে ওঠে, কল-কল, ছল-ছল করে গোঙ্গাতে গোঙ্গাতে ছুটে চলে। কালিন্দীর পূর্ণতা অপরের ঘর ভাঙ্গে, মহানন্দাকে বিস্তৃতি দেয়। হাতে হাত মিলিয়ে দুই বোন পরস্পরের উপস্থিতি ভুলে একত্ব লাভ করে। ভাটির মানুষ কালিন্দীর কথা স্মরণ করে না, মহানন্দার জয়গান করে।

এপারে কোতোয়ালী বুরুজ।

সুলতানী শাসনের বিগতপ্রায় স্মৃতির বাহক, অতীতের মৌন সাক্ষ্য বহন করতে দাঁড়িয়ে রয়েছে শতাব্দীর আঘাত বুকে করে। মোহনায় বুরুজের মাথায় দাঁড়িয়ে যারা পাহারা দিত তারা আর নেই। তাদের বংশধরদের

পরিচয় অজ্ঞাত। গোলন্দাজ, তীরন্দাজ আর কোতোয়ালের পদধ্বনি শোনা-যায় না। শোনা যায় দূরের শ্মশান থেকে ভেসে আসা 'হরিবোল' ধ্বনি। রাতের বেলায় কাঁচা শড়কের দুপাশ থেকে শেয়াল ডেকে ওঠে, নদীর দুকূলের স্তব্ধতা ভঙ্গ হয়, প্রতিধ্বনি ভেসে চলে দিগন্তে। বুরুজে চৌকি দেয় চামচিকা আর পেঁচা। বাঁধানো চবুতরায় ক্লান্ত পথিক বিশ্রাম করে। কালিন্দীর কিনারা বরাবর আমের ঘন বন, মাঝে মাঝে পত্রান্তরাল থেকে বনমোরগের বিকট আওয়াজ মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে, প্রতিধ্বনিত হয় নদীর বুকে, পথ চলা মানুষ থমকে দাঁড়ায়। নিস্তব্ধতা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

এপারে পুরাতন শহর। আগে ছিল ফৌজি শহর।

সুলতানী প্রয়োজনে শহর গড়ে উঠেছিল। কালের প্রবাহে শহর মিইয়ে গেছে। ফৌজ আর কুচ করে না, পাথুরে শড়কে রোগজীর্ণ পথিকের কম্পিত পদক্ষেপন কোন আওয়াজ তোলে না। মাঝে মাঝে গোযান চলে, গোযানের চলাচলজনিত ক্যাঁচ কোঁচ্ শব্দ শোনা যায় অলস মধ্যাহ্নে। ফৌজি দেউড়ি সব ভেঙ্গে গেছে, কোথাও পাথুরে শড়ক বন্ধ হয়ে গেছে। জনসংখ্যা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়েছে, শুধু খাড়া হয়ে রয়েছে সুলতানী শহরের কঙ্কাল। বিরাট হাম্মের ভঙ্গী রয়েছে, ধ্বনি নেই। সুলতানী কবরখানায় চেরাগ জ্বালাবার লোক নেই, চৌকি দেবার লোক তো দূরের কথা। অসার হয়ে এসেছে জীবনের গতি। পুরাতন শহরের নতুন বাসিন্দারা শুধু মাঝে মাঝে মুখ উঁচিয়ে দেখে। তারা অতীতকে ভুলে নিজের কাজে মন দেয়। অর্ধভগ্ন প্রাচীর-প্রকারের দিকে চেয়ে চেয়ে কেউ কেউ দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কেউ কেউ ওগুলোর অস্তিত্বই মনে রাখতে পারে না। দেহের বিশেষ কোন অঙ্গকে যেমন সব সময় স্মরণ রাখা যায় না, তেমনি তারা স্মরণ রাখতে পারে না পুরাতন শহরের লুপ্ত-প্রায় স্মৃতিকে। বেভুল মানুষ অতীতকে শ্রদ্ধা করে, স্মরণ করে না অন্তর দিয়ে। ভুল-ই তাদের সমাপ্তি, ভুল-ই তাদের প্রশান্তি, ভুল-ই তাদের সান্ত্বনা।

পুরাতন শহর আর কোতোয়ালীর মাঝখানটায় কালিন্দী মহানন্দা গলা জড়াজড়ি করে সংগমতীর্থ সৃষ্টি করেছে।

পুরাতন শহরের ফেরীঘাট।

বুড়ো বটগাছতলায় বিহারী ঘাটোয়াল সংগমতীর্থের পুণ্যার্থীদের ফেরীর পয়সা আদায় করে। স্নানার্থী পুণ্যার্থীর দল স্নান শেষ করে বুড়ো বটগাছ-

তলায় সিন্দুরে মাখানো পাথরগুলোকে সভক্তি নমস্কার জানায়। গাছেরও বয়স হিসাব হয়নি, দেবতার অবস্থিতিকালও হিসাব হয়নি। ভক্তের দল অজ্ঞাতকাল থেকে ভক্তি জানিয়ে আসছে, দেবতার দেহ ভক্তির দানে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে।

ঘাটের কিনারায় টমটমের ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে গাড়োয়ানরা বিড়ি ধরায়। ওত পেতে বসে থাকে শিকারের অপেক্ষায়। পারের নৌকা ঘাটে ভিড়লে চিৎকার করে ওঠে, 'টিশান, টিশান, পংখীরাজ মিঞা, যাবেন বাবু'। যাত্রীর পোঁটলা টেনে তোলে একজন, একজন হাত ধরে টানতে টানতে টমটমে তোলে। রুগ্ন অশ্বতর অধিক ওজনের ভারে হ্রেষাধ্বনিতে বিরক্তি জ্ঞাপন করে। সেকথা ভাববার অবসর নেই গাড়োয়ানদের, তারা কোনরকমে হাত ধরে টানতে পারলে সেদিনকার রুজিরোজগারের চিন্তা থেকে নিষ্কৃতি পায়। মানুষ আর পোঁটলা সব কিছুই তাদের কাছে সমান।

ঘাটের মাথায় উঁচু পাড়ের ওপর ইংরেজের থানা। থানার পেটা-ঘড়ি পুরাতন শহরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে। বেলা গড়িয়ে এলে পারঘাটায় লোক সমাগম কমতে থাকে। কোতোয়ালীর আমবাগান ধুঁয়োটে হতে থাকে, পড়ন্ত বেলার আলো নিভলে ধীরে ধীরে আমবাগান আঁধারে মিলিয়ে যায়। শুক্লপক্ষের চাঁদ উঠলে নদীর কালো জলে আমবাগানের ছায়া পড়ে। চঞ্চল তরঙ্গে চলন্ত পাহাড়ের স্বপ্ন সৃষ্টি করে। জ্যোৎস্না রাতে অন্ধকারের প্রহরীর মত উচ্চশীর্ষ আমবাগান দাঁড়িয়ে থাকে। উন্মুক্ত আকাশের তলায় আমবাগানের কালো ছায়া প্রকৃতির সতর্ক সাবধানীর ইঙ্গিত দেয়। এপারের বুড়ো বটগাছতলায় বিহারী মাঝির দল ঢোল বাজিয়ে 'রামাহো' গান করে। তাদের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর আব বিকট বাদ্যধ্বনি পুরাতন নিস্তব্ধ শহরের বুকে ক্ষণকালের জন্য অশান্তির ছোঁয়াচ আনে।

দিনের আলোতে তবুও মানুষের আনাগোনা থাকে। সন্ধ্যা নেমে আসতেই পুরাতন শহরের কর্মব্যস্ততায় ছেদ পড়ে। আঁধারী রাতে ভাঙ্গা ঘরের ফাঁক দিয়ে কেরোসিন বাতির টিমটিমে আলো বহুদূর থেকে দেখা যায়। মালের বজরা ঘাটে বেঁধে মাঝিরা বালুচরায় রান্না চড়ায়। উনুনের লাল আভা নদীর জলে ঢেউয়ের তালে তালে নাচতে থাকে। পর্ণকুটিরের বাসিন্দাদের জোনাকির মত টিমটিমে আলো নিস্তব্ধ শহরের ক্ষীণ প্রাণের স্পন্দন জানিয়ে দেয়, ইঙ্গিতে

বুঝিয়ে দেয় পুরাতন শহরে মানুষের আস্তানার অস্তিত্ব। ভগ্ন কুটিরের বেড়া ভেদ করে আসে প্রদীপের ক্ষীণ আলো; ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট জীবনের ইঙ্গিত।

শহর পুরাতন।

পুরাতনের ছেঁড়া উর্দিগায়ে দিয়ে নতুন মানুষের দল বাঁচার দুর্ভোগ বয়ে বেড়ায়। সকালে বিকালে আপ-ডাউন ছয়খানা ট্রেন ছোট লাইন বেয়ে, জঙ্গলের বুক কেটে পুরাতন শহরের নতুন স্টেশনে এসে দাঁড়ায়। এই আসা-যাওয়া শহরে সাময়িক স্পন্দন সৃষ্টি করে। হুস্ হুস্ করতে করতে গাড়ি আমবাগানের আড়ালে ঢাকা পড়লেই এই সাময়িক স্পন্দন ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে আসে, আবার হিম নিস্তব্ধতা নেমে আসে শহরের বুকে। বাজারের প্রাইকার, মামলাবাজ বাদি-বিবাদি টাউন থেকে ফিরে আসে। তাদের আগমনের হুল্লোর কিছুটা আমেজ করা যায় নন্দমুদির দোকানে। নন্দমুদির কাঠের বেঞ্চে পাঁচ গাঁয়ের পাঁচ রকম লোকের সাক্ষাত ঘটে। যে যার মালপত্তর রেখে হাতের চেটোয় কল্কে চেপে ধরে তামাকে দু'এক টান দিয়ে নেয়। টাউনের খোসগল্প শোনায়, বাজার দরের উঠতি-পড়তি নিয়ে মাথা ঘামায়। মৌজ জমবার আগেই অনেকে পাড়ি জমায়। শহর আবার ঝিমিয়ে পড়ে। নন্দমুদিও বাতি নিভিয়ে টিনের ঝাঁপ বন্ধ করে বাড়ি ফিরে যায়।

শেষরাতে পাহারাওয়ালা সেপাইদের বুটের আওয়াজে কোন কোন দিন শড়ক-পাহারাদার অভিভাবকবিহীন কুকুরগুলো দল বেঁধে ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। প্রাত্যহিক রুটিন বাঁধা সারমেয় চিৎকার শুনে শহরের বাসিন্দারা পাশ ফিরে শোয়। ওপার থেকে চৌকিদারের হাঁক নদীর বুকবেয়ে বাতাসে ভাসতে ভাসতে এপারের শহরের বুকে ধাক্কা দেয়। এপারের থানায় ঘড়ি পেটা হয়। নইলে নিস্তব্ধ শহরের নিশুতি ভঙ্গ কখনও ঘটে না।

জীবনধারায় কোন তরঙ্গ ওঠেনা। সামান্য সোরগোলে মাঝে মাঝে শহরের বাসিন্দারা চমকে ওঠে। কান পেতে শুয়ে ইষ্টনাম জপতে জপতে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। ওপারের শ্মশানে মাঝে মাঝে সোরগোল শোনা যায়। রাতের আঁধারে প্রিয়জনহারার করুণ বিলাপ নিস্তব্ধতাকে ভয়ঙ্কর করে তোলে। তাতেও কোন আলোড়ন উঠে না, শীতের উত্তরমুখী হাওয়ার মত কনকনানি সৃষ্টি করে, আবার ঝিমিয়ে পড়ে। শহরের নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রায় নতুনত্ব দেখা দেয় না।

এপারের লোক ওপারের শ্মশানে দিনরাত ধুনি জ্বলতে দেখে। রাতের আঁধারে হিংস্র বন্যপশুর চোখের মত চক চক করে ধুনির আলো। এপার থেকেও স্পষ্ট দেখা যায় ধুনির চকচকানি, মাঝরাতে ধুনির আলোতে মানুষের ছায়া দেখা যায় অনেক দূর থেকে।

কানে কানে খবর ভেসে বেড়ায়, অবধূত এসেছে। সাধু-সন্ত, সাধক, সন্ন্যাসী, যোগী-পীর-ফকির,—যার যা মনে হয় সে তাই বলে। রটনা হয়েছে, দিনের বেলায় সাধুকে দেখা যায় না। কেউ কেউ বলে তান্ত্রিক-কাপালিক। শেষরাতে তান্ত্রিকবাবা খড়ম পায়ে দিয়ে কালিন্দীর বুকে লম্বা লম্বা পা ফেলে হেঁটে বেড়ায়। সকাল হবার আগেই কালিন্দীর জলে আত্মগোপন করে। মাঝরাতে কাপালিক শব সাধনা করে। লোকে সাধুকে না দেখেই ভয়ে ভয়ে প্রণাম জানায়। অনেকেই বলে, শুনেছি কাপালিক এসেছে; যারা বলে তারা কেউ কাপালিককে চোখে দেখেনি।

শব সাধনা! চমকে উঠল মিশিরজি। হাতের চেটোতে তামাকের গুঁড়ো। ঘাটোয়ালের ছোট ডিবে থেকে সবেমাত্র চূণ নিয়ে দু'এক টেপা দিয়েছে।

মিশিরের বিস্মিত মুখের দিকে চোখ তুলে ঘাটোয়াল বলল, হাঁ-জি, শও-সাধনা হোতা হ্যায়।

মিশিরজির আঙুল থেমে গেল, চেটো বিশ্রাম পেল, অস্থিরতার স্পর্শ তার চোখে মুখে। উদ্‌গ্রীবভাবে বলল, কোন কহ্‌লন?

ঘাটোয়াল রামতিরিক্কে মুরুব্বী চালে বলল, কাল মিঞালোগ আইলন। উ-লোগ জব আবোছে, উ-লোগ দেখোছে। সাধুবাবা মুর্দাপর বৈঠ্‌লন। বলা শেষ করে রামতিরিক্কে হাত জোড় করে সাধুর উদ্দেশ্যে নমস্কার করল। ঘাটোয়াল অঙ্গভঙ্গী করে বৃত্তান্তটি বিবৃত করা মাত্র মিশিরজির গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল। ভয়ে অথবা আবেগে আত্মহারা হয়ে বলল, সাচ্‌!

ঘাটোয়াল দ্বিতীয়বার হাত জোড় করে সাধুর উদ্দেশ্যে নমস্কার জানাচ্ছিল, মিশিরজির কথার জবাবে মাথা নাড়ল। নমস্কার জানানো শেষকরে বলল, হুঁ সাচ্‌।

খবর ছুটে চলল।

মিশিরজি পুরাতন শহরের বে-সরকারী বেতারবার্তা। ছোট শহরের হরদরজায় তার অবাধগতি। হাতের চেটোতে তামাক চুণ মর্দন করতে করতে মিশিরজি লাল শুরকীর পথ ধরল।

প্রথম সাক্ষাতে নিতাই গয়লার সাথে। রসাল-কাহিনী সমাপ্ত করে মিশিরজি বলল, বুঝলন ?

নিতাই গয়লা মিশিরজির কাঁধ থেকে গামছাটা তুলে নিয়ে পাশের ডোবার জলে ভিজিয়ে এনে বলল, অবহি টাকৃমে ডারদো মিশিরজি, শির ঠাণ্ডা হইবন্।

মিশিরজি নিতাইকে ভাল করে চেনে। এত বড় সংবাদটি শোনাবার মত লোক হাতের কাছে না থাকায় নিতাইকে শোনাতে বাধ্য হয়েছিল, নইলে নিতাইকে অনাহুত ভাবে শুনিয়া সে অপদস্থ হতে চায়নি। বুঝতে পারল, নিতাই ঠাট্টা করছে। বিরক্তি দমন করে বলল, তু বিশোয়াস না করলুরে ভেমুয়া। আপনা চোখসে দেখকে আ।

নিতাই মিশিরজিকে জোগান দেয়। নিতাই পাওনাদার। সারা বছরের পাওনা আমের মরশুমে শোধ করে। পুরো পাওনা কখনও কাউকে মিশিরজি দেয় না, নিতাইও ব্যতিক্রম নয়। শুধু দেবদ্বিজে অগাধ ভক্তির প্রাবল্যে নিতাই জোগান বন্ধ করেনি। কমতি পয়সা মহানন্দা জোগায়। দুধে হাত পড়ে না কখনও।

মিশিরজির নানা কথা নানা ভাবে নিতাই শুনেছে। সাক্ষাতে ঠাট্টা করে, অসাক্ষাতে গাল দেয়। দরকার মত গড় হয়ে প্রণাম করে পাপমোচন করে।

কিছুদিন আগে মিশিরজি খবর দিল, লতুন ডাংদর আইলন্। এক বুঁদ দাওয়া এক গিরাস পাণিমে দেইলন। উ-পিহ্লন তো বেমার একদম আরাম হইলন্।

সে আবার কি কথা মিশিরজি ? নিতাই অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

উলোক হামুরা ডাংদর বুঝলন।

পুরাতন শহরে নতুন ডাক্তার আসার কথা নিতাই শুনেছে। গরীব-গোবরা মানুষকে চিকিৎসা করছে নতুন ডাক্তার নতুন ধরণের ওষুধ দিয়ে। মিশিরজিকে অপদস্থ করবার লোভ সামলাতে না পেরে বলল, তব্ এক কাজ নাই করলন্ কাহে, এক বুঁদ আপনা কুঁয়ামে ডাল্ দেহ্লন তো সব বেমার আরাম হইলন্।

মিশিরজি জবাব না দিয়ে রাগে গড় গড় করতে করতে নিজের পথ ধরল। এমনি ধারা মাঝে মাঝেই ঘটে।

আজও নিতাই ঠাট্টা করছে বুঝতে পেরে মিশিরজি লম্বা লম্বা পা ফেলে রওনা হতেই নিতাই পেছু ডেকে বলল, তোমাকেও যেতে হবে মিশিরজি। আমি ডরপো লোক, ভিরমি হবে। তুমি থাকলে ভরসা পাই।

মিশিরজি সমূহ বিপদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষার তাগিদে বলল, নিশ্চয় যাইবন। হামি বারভন লোগ, ডরপো নেহিরে।

মিশিরজি যে ভয় পায়নি তারই প্রমাণ স্বরূপ দুমদাম্ পা ফেলে নিষ্ক্রান্ত হল। নিতাই হাঁপ ছাড়ল। আধ সের দুধের উপরি জোগান থেকে বেঁচে গেল।

সকালের এই শুভ সংবাদটি মাঠে মারা গেল দেখে মিশির যে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয়েছিল একথা বলা বাহুল্য কিন্তু নিতাই যে নিয়মিত দুধের জোগানদারী করতে বিলম্ব করল একথাও অনস্বীকার্য্য। মিশিরজি চলে যাওয়া মাত্র নিতাই কল্কেতে সবে তামাক ভরেছে এমন সময় নদী থেকে স্নান সেরে পদ্ম উঠানে পা দিল! এত বেলা অবধি নিতাইকে বাড়িতে বসে থাকতে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, জোগানে যাওনি?

তামাকে সুখটান দিয়ে দুধের কলসীর মুখে গামছা বাঁধতে বাঁধতে নিতাই বলল, মিশিরজি এসেছিল কিনা।

মিশিরজির কথা শুনে পদ্ম জ্বলে উঠল। বলল, সকাল বেলায় পোড়ামুখো ননীর ভাগ নিতে এসেছিল বুঝি?

ইচ্ছাটা বোধ হয় তাই ছিল, তা বলতে না পেরে গাঁজাখুরি গল্প আরম্ভ করেছিল।

আর তুমি বুঝি তাই বসে বসে শুনছিলে?

আহা, হাজার হোক বামুন তো, তার ওপর বলল, ওপারের শ্মশানে সিদ্ধপুরুষ এসেছে, তাই একটু শুনছিলাম। হাজার হোক কাপালিক সিদ্ধপুরুষ, বলেই নিতাই হাসল।

পদ্ম নিতাইয়ের সব কথা ঠিক বুঝল কিনা ঠিক বুঝতে পারা গেলনা। কেবলমাত্র শোনা গেল, তাই নাকি! বলেই পদ্ম ত্বরিত পদক্ষেপে দাওয়াতে উঠে দাঁড়াল। নিতাইও দুধের কলসী নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। উভয়পক্ষের বক্তব্য তখনকার মত অসমাপ্ত রইল।

দুপুর বেলায় দাদনি দুধ নিয়ে নিতাই ওপার থেকে ফেরে। ফিরবার পথে নদী থেকে স্নান সেরে ভিজে কাপড়েই বাড়ী ঢোকে। পদ্ম গোয়াল পরিষ্কার করে, ধান শুকোয়, বেশী বেলা হলেই দাওয়াতে আঁচল পেতে শুয়ে শুয়ে নিতাইয়ের অপেক্ষা করে।

রোজকার মত আজও নিতাইকে ভাত বেড়ে দিয়ে পদ্ম পাখা হাতে করে বসল। নিতাই দু-একগ্রাস ভাত মুখে তোলা· শেষ করতেই পদ্মরাণী ফিসফিসিয়ে বলল, তখন যে বলছিলে কোথায় নাকি কাপালিক এসেছে ?

পদ্মের মুখের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখে নিতাই উদাস ভাবে বলল, এসেছে শুনেছি, দেখিনি।

পদ্ম কোন কথা না বলে পাখা নাড়তে লাগল। নিতাই বুঝল, এইবার পদ্মের বায়না শুরু হবে। পদ্মের কল্পিত বক্তব্য নিতাইয়ের অভিপ্রায় বিরোধী তা নিতাই স্পষ্ট করে বলতে চায় না। পদ্মকে তার বক্তব্য শেষ করবার সুযোগ দেবার জন্যই সেও নীরবে খেয়ে চলছিল।

নিতাই যখন নেহাতই কথাটা উত্থাপন করতে চায় না, তখন পদ্মও ধৈর্য্য ধারণ করতে পারল না! অনেকক্ষণ উসখুস করে পদ্ম বলল, একবার গেলে হয়না।

সলাজ কুণ্ঠিত এই ক'টি শব্দের ভেতর দিয়ে পদ্মের মনোগত নৈরাশ্যজনিত বেদনা পরিস্ফুট হয়ে উঠল। নিতাই বুঝল, পদ্মের দুঃখের উৎস কোথায়। তবু আঘাত দেবার দুষ্ট ইচ্ছা সম্বরণ করতে না পেরে বলল, কেন ? বংশরক্ষার মন্তর নিতে ? অনেক তাবিজ কবজ ত' করলে, এতেও মন উঠেনি ?

পদ্ম মনোগত দুর্বলতার আবেশে সঙ্কোচ বোধ করল। এই দুর্বলতা গোপন করবার অক্ষম প্রয়াস যে কত বড় বঞ্চনা তা পদ্ম না বোঝে এমন নয়। নিতাইয়ের কথায় তার মন আহত কপোতীর মত ছটফট করতে করতে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নিতে চাইছিল। নিতাইয়ের কথা শুধু ব্যর্থতাকে ব্যঙ্গ করল এমন, নয় এই ব্যর্থতাকে অপরাধ বলে স্বীকার করে নিল।

নিতাইয়ের কাছ থেকে এরকম কথা সে অনেকবারই শুনেছে, নতুন কিছু নয়। প্রথম প্রথম পদ্ম জেদ ধরলে নিতাই নিতান্ত অনুগতের মত তার জেদ রক্ষা করতে সাধু ফকির, মন্দির পীঠস্থানে সাধ্যমত নিয়ে গেছে।

সেদিন আর নেই।

আজকাল নিতাই এসব কথা শুনতে চায় না। বললে হাসে, জবাব দেয় না। যদিও কখন জবাব দেয়, সে জবাবে সহানুভূতির লেশমাত্রও থাকে না; অথবা সে ঠাট্টা করে। নেহাৎ বেচাল হলে মিথ্যা স্তোক দেয়। অথচ ক'বছর আগে হারু বোরেগীর মায়ের মুখে শুনে নিজেই উদ্যোগী হয়ে নিতাই তাকে কুতুবশহরে নিয়ে গেছে। মাজারের কাঁঠাল গাছে দড়ি দিয়ে নুড়ি ঝুলিয়ে এসেছে। আশা করেছে, সন্তান লাভ এবার নিশ্চিত। তারপরও পাঁচটা বছর কেটে গেছে। দেশ বিদেশের মাতৃত্বকামী বহু মহিলাই মাজারের কাঁঠাল গাছে পাথরের টুকরো ঝুলিয়ে হাতে হাতে ফল পেয়েছে। আজও পদ্ম বিশ্বাস করে ফল সে পাবে। আজও নিষ্ঠার সাথে, সন্তান পাবার আশায় মাজারের অনুশাসন মেনে চলে। অথচ পদ্ম যেখানে ছিল সেখানেই থেকে গেছে। মাতৃত্বলাভের আকুলতাকে ব্যঙ্গ করে একগোছা কবজ-তাবিজ গলায়-হাতে স্থায়ী স্থান অধিকার করে রয়েছে মাত্র। তাদের স্থান চ্যুত করতে নিতাই কখনও চেষ্টা করেনি। পদ্ম এইটুকুতেই খুশী। একদিন যে সু-ফললাভ হবে এ দৃঢ় বিশ্বাস তার মনে গেঁথে রয়েছে, সেই সাথে রয়েছে বার-ব্রত উপবাস।

বিশ বছরের পদ্ম গয়লা পাড়ার ঈর্ষার পাত্র।

নিতাই ঠাট্টা করে তার রূপের জৌলুসকে। বলে, তুমি হলে মাকাল ফল। বাইরে টুকটুকে, ভেতরটা কালো।

পদ্ম ঝামটা দিয়ে উত্তর দিয়েছে। নিতাই হেসেছে। কখনও ঝগড়া করেনি। ঝগড়া করলে পদ্ম খুশী হত। নির্বিকার ভাবে নিতাই পদ্মের শাসন ও শাসানি শুনেছে, প্রতিবাদ জানায়নি। অবশ্য নতুন করে কবজ-তাবিজের কথা উঠলে মৃদু প্রতিবাদের সুরে নিতাই বলেছে, এ জন্মে যখন হল না, পরজন্মের চিন্তা কর।

নিতাই পদ্মের দুঃখ বোঝে। পুরাতন শহরের নিস্তব্ধতার মতই নিস্তব্ধ তার প্রকৃতি। তবুও প্যান-প্যানানি সুরু হলে স্তোক দিয়েছে, কখনও কখনও বলেছে, বয়সতো যায়নি. এত ভাবনার কিসের?

প্রতিবাদের সুরে পদ্ম বলেছে, বয়স হয়নি, বল কিগো, মেয়েমানুষ কুড়িতেই যে বুড়ি।

ব্যর্থতা দীর্ণ হৃদয়ের যে আকুলতা পদ্মের অনুযোগের ভেতর দিয়ে ফেটে পড়তে থাকে তার তুলনা হয় না। কিন্তু অবোধের মাতৃত্বলাভের আকাঙ্খা

পূরণ করবার কোন পথও খোলা নেই। দেহবিজ্ঞান যাকে বঞ্চিত করেছে, মনোবিজ্ঞান শুধু তার চিকিৎসা করতে পারে, সম্পূর্ণতা দিতে পারে না।

পদ্মের কথা শুনে নিতাই অপলকে তাকিয়ে থাকে। জবাব না দিয়ে হাসে। এ হাসিতে নিরাশার ছবি ফুটে ওঠে না, ব্যর্থতাকে ব্যক্ত করবার কোন চিহ্ন তাতে থাকে না।

নিতাইয়ের হাসিতে পদ্মের গা জ্বালা করে, ঝামটা দিয়ে বলে, তোমার এসব খাবে কে ?

খাওয়ার লোকের অভাব হয় কখনও ? ভগবান যাকে দেয়নি তাকে অদৃষ্টের ওপর সব ছেড়ে দিতে হয়।

তাইতো ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু মন যে মানেনা।

পদ্ম ফোঁপায়।

এমনি ধারাই দিন কাটছিল। অভিযোগ অনুযোগের মাঝ দিয়ে দুঃখের প্রলেপ সৃষ্টি হয়ে চলছিল। নিতাই আশা করছিল, শীগ্‌গীরই এমন দিন আসবে যখন পদ্ম তার ব্যর্থতাকে অবশ্য প্রাপ্য বলে মেনে নেবে। অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে প্রাপ্যটুকু তুলে নেবে।

অবধূতের আগমন সংবাদে এই গতিতে কেমন ছেদ পড়ল। পদ্ম আশান্বিত হয়ে উঠল। সেই সুপ্ত আশাকে বাস্তব রূপ দিতে পদ্ম আজ কথাটা উত্থাপন করেছিল। নিতাইয়ের উদাসভাব লক্ষ্য করে পদ্ম কেমন যেন বোকা হয়ে গেল। পাখাটা পিঁড়ির পাশে রেখে ঘরের দাওয়াতে এসে দাঁড়াল। পদ্ম জানে, কথা বাড়ালে নিতাইয়ের মুখ খুলে যাবে। নিতাইয়ের মুখে কোন আগল নেই, কখন যে কি বলে উঠবে তার ঠিক নেই। কখনও সামান্য প্রতিবাদ জানাতে গেলে নিতাই বলেছে, আজ আমরা না হয় ভেমো গয়লা। এমন একদিন ছিল যখন আমাদেরই রাধাকেষ্ট কত লীলা খেলা দেখিয়ে গেছে, জানো !

বক্তব্য স্পষ্ট না হলেও ইঙ্গিতটা পদ্ম বোঝে।

তাই কথা না বাড়িয়ে আজও দাওয়াতে এসে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল।

নিতাই ডাকল, বলল, রাগ করলে ?

দাওয়া থেকে পদ্ম উত্তর দিল, তারও কি উপায় আছে।

এটাও রাগের কথা। তোমার কোথায় কষ্ট তা বুঝি। খোদার ওপর খোদকারী করবার আমাদের ক্ষ্যামতা আছে কি? বেশ আমি গিয়ে খবর নিয়ে আসছি তারপর তুমি একদিন যেও, কেমন?

এত সহজে নিতাই যে রাজি হবে পদ্ম স্বপ্নেও তা ভাবেনি। নিতাইয়ের সম্মতিতে কেমন একটা সাফল্যের আনন্দ সে অনুভব করল, বলল, বেশ তাই কর। এই কথাটুকুতে বোঝা গেল না পদ্মের আগ্রহ কত তীব্র। তবে অসহায়তার আপেক্ষ যেন অবলম্বন পাবার অপেক্ষায় ছিল, সেইটুকু পেয়েই পদ্ম পরিতৃপ্ত।

নিতাই তখনকার মত নিষ্কৃতি পেলেও, ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটল না। 'করব' স্বীকার করলেই তা যে করণীয়, নিতাই হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারল। রোজ পদ্ম জিজ্ঞাসা করে, গিয়েছিলে?

না বুঝতে পারার ভান করে নিতাই বলে, কোথায়?

সেই ওপারের সন্ন্যেসীর কাছে।

ওঃ। তাই বল। একেবারে ভুলে গেছি। আচ্ছা কাল যাব।

এমনিধারা জিজ্ঞাসাবাদের মধ্য দিয়েই নিতাই একদিন বলল, দিনের বেলায় তেনার সাক্ষাৎ মেলে না। রাতের বেলায় শ্মশানে যেতে গা ছম্-ছম্ করে। ভিরমি লাগার ভয় আছে।

অনুযোগভরা অভিমানের সুরে পদ্ম বলল, কত লোক যাচ্ছে।

যারা যাচ্ছে তাদের ঘরে পদ্ম নেই। পদ্মকে রেখে রাতের বেলায় কোথাও যেতে পারব না বাপু। বেন্দাবন ছেড়ে মোথরো যাওয়া আর হবে না।

পদ্ম কুণ্ঠিত ভাবে বলল, ফাঁকি দিওনা, আসলে তোমার যাবার ইচ্ছে নেই।

কে বলল ইচ্ছে নেই। আমার মহাশত্তুরেও একথা বলতে পারবে না। বেশ কালকেই যাব। কিছু ভাল মন্দ হলে আমি কিন্তু দায়ী নই। তখন তোমার ভাবনা তোমাকেই ভাবতে হবে।

পদ্ম শঙ্কিত না হল এমন নয়, কিন্তু অতৃপ্তির ব্যথা ভয়কে জয় করে। নিতাইকে যাবার জন্য তবুও সে অনুরোধ জানাল। মাতৃত্বকামী নারীর যুক্তিহীন বক্তব্য পদ্মের মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

নিতাই ইচ্ছা করেই দায় মাথায় নিয়েছে। সে যদি অকারণ মিশিরজির প্রসঙ্গ সেদিন উত্থাপন না করত তা হলে এই বিপদে পড়তে হত না, প্রথমে

এতটা গুরুত্ব দিয়ে স্বীকৃতি দেয়নি। নিতাই সেদিন নদীর কিনারা থেকে গরু এনে গোয়ালে বেঁধেই বের হল সংবাদ সংগ্রহ করতে। টাউনের সংবাদ-কেন্দ্র নন্দমুদির দোকান আর পুরাতন শহরের সংবাদ কেন্দ্র রামতিরিক্কের ঘাট। দুনিয়ার সব খবর জমায়েত হয় সেখানে, সেখান থেকে মুখে মুখে ডালপালা গজায়। সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে।

সূর্য ডুবতে না ডুবতে নিতাই ঘাটের বটতলায় হাজির হল। দিনের শেষ খেয়া জমিয়ে মাঝির দল বটতলায় জমা হয়েছে। গওনার নৌকার মাঝিরা ঘাটে নৌকা বেঁধে বটতলায় উনুন পেতে রান্নার জোগাড় করছে। বলতে গেলে ঘাট তখন জম্ জমাট।

রামতিরিক্কের ছোট কল্কেটা হাত বদলাচ্ছে। শুকনো নেশায় রক্তে তখন চন্ চন্ সুরু হয়েছে। নিতাইকে দেখতে পেয়ে রামতিরিক্কে ডাকল। নিতাই কাছে আসতেই জিজ্ঞাসা করল, হোবে না-কি-হো ?

সবিনয়ে মাথা নেড়ে অসম্মতি জানিয়ে নিতাই একপাশে বসল।

নিতাইকে লক্ষ্য করে আবার রামতিরিক্কে বলল, তু একদম বরবাদি লোগ। দেওতা শিউজি পিয়ে লিলন্ আর তু কহ্লন না পিউবন্।

নিতাই হাসল, বলল, তোমরা শিবের পুকুর পাড়ের পেরজা।

আর তু-লোগ ?

বিষ্টু। স্বয়ং বিষ্টু। বুঝলে তিরিক্কে বাবা। আমরা মধু খাই, গাঁজা খাই না। জানোতো সমুদ্দুর মন্থন করে বিষ্টু অমৃত পেয়েছিল। দেবতরা অমৃত খেলো। অসুররা খেতে না পেয়ে গাছের পাতা পুড়িয়ে নাকে ধোঁয়া দিল, যা তোমরা আজও দিচ্ছ।

রামতিরিক্কে হাসল। নেশা তখন জমজমাট, তু ঠিক কহ্লন। হামি লোগ শিউজিকা চেলা বনলন। হেঁ-হেঁ-হেঁ,

বিরাট কৃতিত্বের হাসি।

হাসির ধাক্কায় রামতিরিক্কের লাল চোখ আরও লাল হয়ে উঠল। অহেতুক হাসি রোধ করতে খক্ খক্ করে কাশতে লাগল।

কা ভইলো মহাজন ? জিজ্ঞাসা করল ফেরীর মাঝি।

রামতিরিক্কে কোন রকমে সামলে নিয়ে বলল, কুচু নেহি।

নিতাই ফিস্ ফিস্ করে বলল, ওপারে না-কি সিদ্ধবাবা এসেছে ?

রামতিরিক্কের গলা দিয়ে একটি মাত্র শব্দ বের হল, হ্।

নিতাই আবার জিজ্ঞাসা করল, সিদ্ধবাবা না-কি নদীর উপর দিয়ে হেঁটে বেড়ায়, দিনের বেলায় না-কি তাকে দেখা যায় না।

আবার আওয়াজ হল, হ্।

রামতিরিক্কের সঙ্গীর দল আস্তে আস্তে এগিয়ে বসল। নিতাই আরও কিছু জিজ্ঞাসা করত। মিশিরজিকে আসতে দেখে থেমে গেল। ঘাটোয়াল মিশিরজিকে সপ্রতিভ ভাবে সাদর আহবান জানালো, আওজি মিশিরজি!

মিশিরজি বাঁশের মাচাতে ভাল করে বসে ঘাটোয়ালকে জিজ্ঞাসা করল, তু সাধুবাবাকো পাশ গেইলু?

নেহি, বলে ঘাটোয়াল কল্কেটা মাঝিদের কাছ থেকে চেয়ে নিল। ভক্তিভরে কল্কেটা কপালে ঠেকিয়ে মিশিরজিকে জিজ্ঞাসা করল, সেওয়া করবন্?

মিশিরজি বাক্যদ্বারা মনোভাব ব্যক্ত না করে কল্কেটাই হাত বাড়িয়ে নিল। বার দুই জয় শিউজি, বম্ বম্ ধ্বনি দিয়ে সেবা শেষ করল। কল্কে আবার হাত বদল হতে লাগল।

মিশিরজি এতক্ষণ নিতাইকে দেখতে পায়নি। গলা পরিষ্কার করে থুতু ফেলতে গিয়ে নিতাইকে দেখে বলল, আরে ভেমুয়া, তু কাহে?

সিদ্ধবাবার খবর নিতে এসেছি।

মিশির একটু ভীতভাবে জিজ্ঞাসা করল, যাইবু?

যাব। সঙ্গী পাচ্ছি না। তুমি যদি যাও, আমিও যাব।

মিশির কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল। মিশিরকে জবাব দেবার দায় থেকে রক্ষা করল ঘাটোয়াল। হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে বলল, কোই না জায় হামি যাইবো। হামি লোগ বেটাছিলে আছে। ডর হামি নাই জানে।

বলা শেষ করে ঘাটোয়াল কুর্তা গায়ে দিয়ে নিল। বটগাছের সাথে দাঁড় করানো লাঠিটা টেনে নিয়ে বলল চল।

নিতাই এতটা আশা করেনি। যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েও আসেনি। এসেছিল সংবাদ সংগ্রহ করতে। সুযোগ বুঝে একদিন গেলেই হল। মিশিরকে উত্তেজিত করতে অথবা ভয় দেখাতে যা বলেছে তার জন্যই সে অপ্রস্তুত হয়ে গেল। তবুও সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলো।

দৃশ্য পরিবর্তনটা ঘটল আকস্মিকভাবে। ছেঁড়া নাগরা জুতোয় পা ঢোকাতে

ঢোকাতে ঘাটোয়াল মিশিরজির হাত ধরে বলল, মিশিরজি ভি চলো। একসাথ সব লোক যাইবন্।

মিশিরজি বুঝল এবার কঠিন স্থানে তার পা পড়েছে। নিজের দুর্বলতা অপরকে জানতে দেওয়া মিশিরজির স্বভাব বিরুদ্ধ। আত্মপক্ষ সমর্থন করবার মত প্রত্যুৎপন্নমতির তার অভাব নেই। ঘাটোয়ালকে অসন্তুষ্ট করবার ইচ্ছা তার নেই। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সে মনে মনে শঙ্কিত হয়েও বেশ সরল সহজভাবে বলল, জরুর যাব। লেকিন তিথি-নকষত্তর না দেখকে মৎ যাও। সাধুবাবা বিগড় জায় তো হামানিকো বেহাল হইবন্। বুঝলন্।

যুক্তিটা ঘাটোয়ালের মনঃপূত হল। সে মাথা নেড়ে বলল, বাত তো ঠিক হ্যায়। সাধুবাবা বিগড় জায় তো সাচ্মুচ্ বেহাল হইবন্।

শুষ্ক পদার্থ পান করবার পর নয়ন যুগল রক্তাভ ও ঘূর্ণিত। যুক্তি যাচাই করবার মত তার মস্তিষ্কের অবস্থা নয়। মিশিরজি ব্রাহ্মণ অতএব তার যুক্তি সর্বদা গ্রহণীয়।

মিশিরজি আত্মপ্রসাদের স্বরে বলল, তু ঠিক সমঝোল্। বাত ঠিক হ্যায় কি নেহি? বোল্, তুভি বোল্ ভেমুয়া।

কেউ কোন প্রতিবাদ জানাল না। আবেগকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার বিপদ সম্বন্ধে সকলেই সমান পরিচিত। তাই মিশিরের যুক্তি অ-যুক্তি হলেও সবাই মেনে নিলো।

মিশিরজি দম ফেলে বাঁচল।

ঘাটোয়াল কুর্তাটা খুলে রাখতে রাখতে অদৃশ্যকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করে উঠল, ভাত পাকাইলু?

নিকটবর্তী ঝুপরি থেকে বামাকণ্ঠে জবাব এল, হুঁ।

সুযোগ বুঝে মিশির শহরের পথ ধরল। নিতাইও কেমন যেন উত্তেজনার হাত থেকে রেহাই পেয়ে বাড়ি দিকে পা ফেলল। ঘাটোয়াল পরবর্তী কষ্কের জন্য ফেরীর মাঝিকে তাগাদা দিয়ে ঝিমোতে লাগলো।

শহর পুরাতন। ততোধিক পুরাতন মাটির ও মানুষের ঐতিহ্য। পুরাতন শহরের খোয়া বাঁধানো শড়ক নদী পেরিয়ে দক্ষিণে এসে মিশেছে কাঁচা পথে পিয়াস বাড়ির কিনারায়, উত্তরে শেষ হয়েছে পাণ্ডুয়ার শেষ সীমানায়।

পনর বছর কেটে গেছে এই পুরাতন শহরের কোলে। আসবার সময় যেমন একা এসেছিল মতিহারী থেকে, তেমনি একাই থেকে গেছে মিশির। পুরাতন শহরে আসবার আগে দু'বছর টাউনে সে চাকরি করেছে। কি চাকরি করেছে কাউকে বলে না। লোকের মুখে শোনা যায়, কোন উকিলবাবুর বাড়িতে সে রসুই করত। রসুইখানা থেকে হঠাৎ একদিন মিশিরজি উধাও হল। কেন গেল, তাও অজ্ঞাত রয়ে গেছে। পুরাতন শহর পেরিয়ে উকিলবাবুর মুহুরী আসা যাওয়া করত তার নিজগ্রাম বিনন্দবাটিতে। তার কাছেই কেউ কেউ শুনেছে কুৎসিত রোগাক্রান্ত হওয়াতে মিশিরকে রসুইখানার লোভনীয় কর্ম হতে বিদায় দেওয়া হয়েছিল। মিশির এমন কেউ নয় যে তাকে লোকে মনে রাখবে। অখ্যাত মিশির বিস্মৃতির অতল গহ্বরে অনেক দিন আগেই মিলিয়ে গেছে। এরই কিছুকাল পরে মিশিরকে দেখা গেল কোতোয়ালির সিংহীবাবুদের দেউড়িতে। মিশির হাতাখুন্তি ছেড়ে লাঠি কাঁধে নিয়ে প্রবেশ করল রঙ্গভূমিতে।

কোতোয়ালীর গায়ে গা দিয়ে রয়েছে জোত।

জোতের জোতদার অবিনাশ চৌধুরী মাতৃহীনা কন্যা বিশাখাকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছিল। কন্যার ভবিষ্যৎ চিন্তায় দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ তার নৈতিক কর্তব্যবোধে আঘাত দিয়েছিল বলেই আর বিবাহ করতে পারেনি। নবমবর্ষ প্রাপ্তিমাত্র বিশাখাকে রাধানাথ ভট্টাচার্যের পাঠশালা ছাড়িয়ে এনে সুপাত্র মনে করে মিশিরের সাথে বিয়ে দিয়েছিল।

এই বিবাহে গ্রামস্থ ভদ্রলোকেরা সম্মতি জানায়নি। সকলের আপত্তি অগ্রাহ্য করেই অবিনাশ বিশাখার বিয়ে দিয়েছিল। অবিনাশ গ্রাম্য হিসাবে অর্থবান ব্যক্তি হয়েও কেন যে এই বিবাহ দিল, এ বিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ থেকে গেছে কিন্তু অবিনাশ বলত, বাংলা দেশেই থাকি আর যাই করি আমরা তো আসলে মিথিলার লোক। সৎ মৈথিলী ব্রাহ্মণ পাত্র তায় সুপুরুষ তার হাতে কন্যা সমর্পন মোটেই যুক্তি বিরুদ্ধ নয়।

গ্রামস্থ লোকেরা মতিহারীর এই খাজা মৈথিলী পুঙ্গবের রূপের ব্যাখ্যা শুনতে চায়নি। তারা মিশিরকে অজ্ঞাতকুলশীল বলেই মনে করেছে। তাই মাঝে মাঝেই অবিনাশের কাছে অনুযোগ করেছে। অবিনাশ বিরুদ্ধপক্ষকে বলেছে, আমার ছেলে নেই, এ রকম ছেলে না হলে ঘর জামাই থাকবে কেন?

আর ঘর জামাই না থাকলে অবিনাশের অবর্তমানে এই সম্পত্তি দেখাশোনা কে করবে। গাওনার পর জামাইকে গৃহে স্থান দিলে সবাই বুঝবে, অবিনাশ বুদ্ধিমানের মতোই কাজ করেছে।

অবিনাশের এই অদুরর্শিতার ফল ফলতে বেশি দেরী হল না। শীঘ্রই জানা গেল মিশিরের চরিত্রগত দুর্ব্বলতা এবং দৈহিক রোগ। বালিকা বিশাখা এসব কিছুই জানতো না। বিবাহিত বাস্তব জীবনের সাথে কোন পরিচয় তার ছিল না। মিশির সম্বন্ধে সে মোটেই উৎসুক নয়। হঠাৎ একদিন রাধানাথকে ডেকে অবিনাশ অনুরোধ জানাল, সে যেন তার বাড়িতে নিয়মিত এসে বিশাখাকে লেখাপড়া শেখায়। সেই সাথে কনিষ্ঠা বিধবা ভগ্নী তারামতীকে ডেকে ফিস্ ফিস্ করে কি যেন উপদেশ দিল অবিনাশ অতি সংগোপনে। তারামতী ভ্রাতুষ্পুত্রীকে স্নান করতে নিয়ে গেল মহানন্দার কিনারায়। সাজিমাটি দিয়ে ঘসে তুলে ফেলল বিশাখার মাথা থেকে সিন্দুরের দাগ। বিশাখা কিছুই বুঝলনা। তবে নতুন করে বইকেতাব নিয়ে সকালে বিকেলে পড়তে বসবার অনিচ্ছাটুকু গোপন রাখতে পারল না। অবিনাশকে কিছু বলতে না পেরে তারামতীকেই বলল, পিসী, পড়তে ভাল লাগেনা। কথাটা তারামতী অবিনাশের কানে তুলতেই অবিনাশ রাধানাথকে ডেকে পাঠাল।

বিশাখার পড়াশোনার দিকে মন নেই মনে হচ্ছে, কি করা যাবে পণ্ডিত ? প্রশ্ন করল অবিনাশ। তার কণ্ঠস্বরে অত্যধিক উদ্বেগ।

রাধানাথ চব্বিশ বৎসরের যুবক। বংশ পরম্পরায় শাস্ত্র আলোচনা ও যাজনবৃত্তি পেশা। গ্রামের প্রতি গৃহে তার যাতায়াত, প্রতি দেবস্থানে তার দেওয়া ফুল চন্দন না হলে পূজা আজকাল অসম্পূর্ণ মনে হয়। রাধানাথের পিতা পণ্ডিত লোক ছিলেন, তিনি কি করে বুঝেছিলেন, কেবলমাত্র ধর্মসংক্রান্ত শিক্ষা বর্তমান কালের উপযোগী নয়, এই শিক্ষার সাথে ইংরেজি শিক্ষারও প্রয়োজন। গরীব ব্রাহ্মণ অনাহার অর্দ্ধাহার সহ্য করেও পুত্রকে টাউনে রেখে পড়িয়েছেন। রাধানাথ সংস্কৃত টোলের পড়া ও প্রবেশিকা পাস একই সাথে শেষ করে কলেজে পড়তে গিয়েছিল। দুই বছর কলেজে পড়ে পরীক্ষা দিয়ে রাধানাথ গ্রামে এসে পিতার যাজনবৃত্তি গ্রহন এবং গ্রামে পাঠশালা স্থাপন করে কলেজীয় জীবনের পরিসমাপ্তি টেনে দিয়েছিল। সেও প্রায় ছয় বৎসর হয়ে

গেছে। পিতা যদুনাথ জিজ্ঞাসা করেছিল, আর দুটো বৎসর পড়লে বি-এ পাশ করতে পারতি ?

হয়ত পারতাম কিন্তু বি-এ পাশ করে ডেপুটি না হোক দারোগা হবার স্পৃহা আমার নেই। পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য রক্ষা আমার ধর্ম। এই এলাকায় ছোট ছেলে মেয়েদের পড়বার কোন বিদ্যালয় নেই, এদের জন্য পাঠশালা করব।

যদুনাথ একাল ও সেকালের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে অষ্টাদশ বর্ষীয় পুত্রের যুক্তিকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। রাধানাথ বৃদ্ধ পিতার সকল কাজ নিজের হাতে তুলে নিয়ে পাঠশালা খুলেছিল। পাঠশালায় পড়ুয়া সংগ্রহ সহজ হয় নি। দু'চার জন করে ক্রমে ক্রমে আসতে থাকে পড়ুয়া। ছেলেদের সাথে মেয়েরাও এল।

প্রথম এসেছিল বিশাখা।

বিয়ের পর বিশাখা আর পাঠশালায় আসেনি। হঠাৎ দুবছর পর একদিন অবিনাশ রাধানাথকে ডেকে পাঠিয়ে বিশাখাকে পড়াবার দায় তার ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় রাধানাথ আসছে। বিশাখার মনোগত পড়বার অনিচ্ছা রাধানাথ বুঝতে পারেনি। বুঝবার দরকারও হয়নি।

অবিনাশের এইরূপ প্রশ্নের জন্য রাধানাথ প্রস্তুত ছিল না। হঠাৎ কোন দেবার মত উত্তর সে খুঁজে না পেয়ে বলল, আমাকে তো বলেনি।

যাকে বলবার তাকে বলেছে। কিন্তু লেখাপড়া শেখানোটা জরুরী মনে করছি রাধানাথ। জানতো বিশাখার বিয়ের 'গাওনা' আজও হয়নি। এ গাওনা কখন হবেও না। তোমাদের ওসব বালাই নেই। আমাদের সমাজে বিয়ে অসম্পূর্ণ থাকে যতদিন গাওনা না হয়।

রাধানাথ অবিনাশের বক্তব্য বুঝতে পারল না। অবিনাশ যে কি বলতে চায় তা বুঝতে না পেরে বিস্মিতভাবে অবিনাশের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

কি ভাবছ ?

না, ভাবছি না। আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

অবিনাশ ধীরে ধীরে বলল, সবার অমতে মিশিরের সাথে বিশাখার বিয়ে দিয়েছিলাম। পরে দেখলাম মহা ভুল করেছিলাম। সেই ভুল সংশোধন করতে চাই। আমার তো কোন পুত্র সন্তান নেই। বিশাখাই আমার সব। তার ভবিষ্যত গড়ে দিয়ে না গেলে শান্তিতে মরতে পারব না। তাই যেমন করে হোক তোমাকে বিশাখার পড়াশোনার দায়িত্ব নিতে হবে।

রাধানাথ সম্মতি জানিয়ে বিদায় নিল।

সন্ধ্যাবেলায় বিশাখা বইখাতা নিয়ে আসতেই জিজ্ঞাসা করল, তোমার বাবা বলছিলেন, তোমার নাকি পড়বার ইচ্ছে নেই।

একাদশবর্ষীয়া বিশাখা আচমকা এই জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে না পেরে মুখ নীচু করে বইয়ের পাতা উল্টাতে থাকে।

তোমার কি ইচ্ছা হয়?

মৃদুকণ্ঠে বিশাখা বলল, জানিনা।

তুমি জান না, আমি জানি। তোমার ইচ্ছে হয় আমবাগানে আম কুড়াতে, নদীতে ঝাঁপাই পেটাতে আর পিসির কাছে বসে ভূতের গল্প শুনতে। কেমন, তাই কি না বল?

লজ্জা-রাঙ্গা মুখখানা আঁচল দিয়ে ঢেকে বিশাখা বলল, না পড়লে কি হয় পণ্ডিত মশাই?

মুখ্যু হয়ে থাকতে হয়।

পিসিমা তো পড়তে জানে না।

জানলে কষ্ট পেতেন না।

পিসিমার কষ্ট না ছাই, পিসিমা কখনও কাঁদেনা, কখনও রাগ করে না, বকেও না।

রাধানাথ হাসল।

হাসছেন কেন?

তোমার কথা শুনে। কষ্টটা কি চোখে দেখা যায়। কষ্ট হয় মনে, মনের কথা তুমি কি করে জানবে।

বিশাখা আর কোন জবাব দেয় নি। মনের হদিস এখনও সে খুঁজে পায়নি।

রাধানাথ পাঠক্রমকে আনন্দদায়ক করে তুলতে চেষ্টা করতে থাকে। পাঠের গতি ধীর হলেও এগিয়ে চলতে থাকে।

আরও তিন বছর কেটে গেছে এমনি ভাবে। সেদিনকার বিশাখা আর নেই। বিশাখা যথেষ্ট দূরত্ব রেখে পড়তে বসে। পড়তে পড়তে দুচারটে হুঁ-না বলে পড়ার পর্ব শেষ করতে চায়। হঠাৎ চোখাচোখি হলে লজ্জায় কর্ণমূল পর্যন্ত রাঙা হয়ে ওঠে। পড়ার আগ্রহ যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও নির্ব্বিকার ভাবে

রাধানাথের সামনে বসে পড়তে পারত না। কেমন যেন অহেতুক লজ্জায় মুখ উঁচু করে বসতেও ইতস্তত করত।

বিবাহের পাঁচ বছর পর প্রথম এসে হাজির হল মিশির। বৈঠকখানায় অবিনাশের সাথে দেখা হল মিশিরের। অবিনাশ চিনতে পেরে বসতে দিল, জিজ্ঞাসা করল, কি মনে করে এসেছ মিশির ?

গাওনা হোবে না ? মিশির সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করল।

কিসের গাওনা ? এমন ভাবে অবিনাশ প্রশ্ন করল যাতে মনে হল সে যেন কিছুই জানেনা।

বহুকে হামি ঘরমে লিয়ে যাব।

অবিনাশ প্রথমে সংযতভাবে, পরে কুপিতভাবে মিশিরকে জানিয়ে দিল, এ বিয়ে অসিদ্ধ এবং তার কন্যার সাথে মিশিরের বিবাহ সে স্বীকার করে না।

মিশিরও প্রথমে সংযতভাবে, পরে উত্তেজিত হয়ে প্রতিবাদ জানাল। যাবার বেলায় শাসিয়ে গেল, এর ফল শীঘ্রই ভোগ করতে হবে অবিনাশকে।

মিশির ফিরে যাবার কয়েক সপ্তাহ পরে আদালতের সমন নিয়ে হাজির হল পেয়াদা। স্ত্রী পাবার দাবী জানিয়ে নালিশ করেছে মিশির। অবিনাশ ও বিশাখাকে হাজির হতে হবে আদালতে।

রাতের বেলায় সবাই ঘুমিয়ে পড়লে অবিনাশ নিজের ঘরে বিশাখাকে ডেকে এনে বলল, তোমার বিয়ে দিয়েছিলাম মনে আছে।

লজ্জানত মুখে বিশাখা বলল, হাঁ।

এ বিয়ে দিয়েছিলাম কতকটা খেয়ালে আর কতকটা তোমার ভবিষ্যত ভেবে। পরে দেখলাম এ বিয়ে দেবার মত ভুল ঘটনা আমার জীবনে কখনও ঘটেনি।

অবিনাশ থেমে গেল। সে হয়ত আশা করছিল বিশাখা প্রত্যুত্তরে কিছু বলবে, কিন্তু অসার কাষ্ঠখণ্ডের মত বিশাখা বসে রইল। সে শ্রোতা মাত্র।

কদিন আগে মিশির এসেছিল। সে গাওনা করে তোমাকে নিয়ে যেতে চায়। আমাদের সমাজে গাওনা না হওয়া অবধি বিয়ে অসম্পূর্ণ থাকে তাই এ বিয়ে অসিদ্ধ বলে তাকে বিদায় করে দিয়েছিলাম।

বিশাখার মুখের চেহারা দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু কুণ্ঠায় সে যেন ভেঙে

পড়ছিল। অবিনাশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, মিশির আদালতে নালিশ করেছে। সে আইন দিয়ে তার স্ত্রীকে নিয়ে যেতে চায়। তুমি যেতে রাজি যদি থাক তা হলে ঘরে ঘরে মিটিয়ে ফেলতে চাই, নইলে লড়তে হবে মামলা।

বিশাখার ক্ষীণ অথচ দৃঢ়কণ্ঠ শোনা গেল, না।

কি না ?

মেটানো হবে না। আমি সব খবর জানি।

বিশাখার ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট ভাষণে অবিনাশ চমকে উঠল। যা গোপন করবার চেষ্টা সে করেছে তা গোপন থাকেনি দেখে সে থমকে গেল। তবুও বলল, তোমাকে আদালতে যেতে হবে যে।

যাব।

বিশাখার দৃঢ়তায় অবিনাশ মনে মনে খুশী হল কিন্তু হাঙ্গামা সহজে মিটল না। হিন্দুবিবাহে বিচ্ছেদের কোন ব্যবস্থা না থাকায়, আইনের প্যাঁচে মিশিরের রোগ এবং নৈতিক অধঃপতনের সাক্ষ্য উপস্থিত করে পরস্পর আলাদা বাস করবার আদেশ পেল আদালত থেকে।

আদালতের এই হাঙ্গামা মেটাতে, নানারকম প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে অবিনাশ ও বিশাখার মানসিক ভারসাম্য প্রায় উপে যাবার সামিল হয়েছিল। এত বড় হাঙ্গামা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে এসে অবিনাশ হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। বিশাখাও মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলল। পিতাও কন্যার মাঝে কিন্তু লৌকিকতার একটি দৃঢ় প্রাচীর অজ্ঞাতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল।

কদিন পরে অবিনাশ টাউন থেকে ফিরে এসে রাধানাথকে ডেকে পাঠিয়ে বিশাখার সামনেই বলল, সব মিটিয়ে এলাম।

'সব' বলতে অবিনাশ কি বলতে চায় তা কেউ বুঝল না। দুজনেই তার মুখের দিকে চেয়ে রইল পরবর্তী বক্তব্য শোনবার আশায়।

দানপত্র করে দিলাম। বিগ্রহ শ্যামসুন্দরের নামে সব সম্পত্তি দেবোত্তর করে দিয়ে এলাম, বিশাখাকে করে দিলাম সেবাইত। আর পণ্ডিত, তোমার কাজ হবে দেবপূজার ব্যবস্থা রাখা।

ঘটনাগুলো এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেছে যে রাধানাথ কোন মতামত দেবার অবসর পায়নি, প্রয়োজনও হয়নি। বছর খানেক আগে যদুনাথের মৃত্যুর পর রাধানাথ গ্রামের অভ্যন্তর ভাগ ছেড়ে শেষ সীমানায় একখানা ঘর তুলে বাস

করছিল। সংসারের একমাত্র বন্ধন একটি মাত্র ভগ্নীর বিবাহ দিয়ে রাধানাথ দায় মুক্ত হয়ে নিজের পড়াশোনা আর দেবকার্য নিয়ে গ্রামের একপ্রান্তে বাস করে। সেখানেই তার পাঠশালা, পাকশালা, সব কিছু। বিশাখাকে পড়ানো ভিন্ন আর কিছু করবার আছে একথা রাধানাথ কখনও মনে করেনি। অবিনাশের কথা শুনে তার মনে হল ক্রমশ সে যেন জড়িয়ে পড়ছে এই পরিবারের সাথে। সব কিছু বুঝতে পেরেও রাধানাথ কোন প্রতিবাদ না জানিয়ে দায়িত্ব মাথায় তুলে নিল।

রাধানাথ ফিরে যাবার পর অবিনাশ বেরিয়ে পড়ল চাষবাড়ির খবরদারি করতে। বিশাখা বসল তার পড়াশোনা নিয়ে। তারামতী শ্যামসুন্দরের সেবায় আত্মনিয়োগ করল।

সেদিন পড়াতে বসবার আগে রাধানাথ বলল, কাল থেকে শ্যামের সেবার দায়িত্ব আমার আর তোমার। তুমি উপাচার সাজাবে আমি পূজা করব।

বিশাখা শুধু মাথা নাড়ল।

তা বলে পড়া বন্ধ করা হবে না। তোমাকে প্রবেশিকা পাস করতেই হবে।

বিশাখা এবারও শুধু মাথা নাড়ল।

পড়া শেষ হতেই রাধানাথ ফিরে গেল নিজের আস্তানায়, যাবার সময় উপদেশ দিয়ে গেল কি করে পূজার উপাচার সাজাতে হবে, কখন পড়তে বসতে হবে ইত্যাদি।

সকাল বেলায় রোদ উঠবার আগেই বিশাখা নদী থেকে স্নান করে এসে ভিজে চুলেই পূজার উপকরণ সাজাতে বসল। উপকরণ সাজিয়ে ভোগ রান্নার ব্যবস্থায় গেল। তারামতী ভোগ রান্নার ব্যবস্থা অনেকটা এগিয়ে রেখেছিল। বিশাখা উনুন ধরিয়ে রাঁধতে বসল।

এ এক নতুন জীবনের আনন্দময় পরিবেশ। বিশাখা পূজার খুঁটিনাটির সাথে পরিচিত হয়ে কেমন যেন উদাসীনতা বোধ করতে থাকে। রান্নাঘরে বসে রাধানাথের খড়মের শব্দ শোনবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে ছিল। রাধানাথ আসতে বিলম্ব করায় বিশাখা অস্থিরভাবে ঘর বাহির করছিল। ঠাকুর ঘরে ঢুকে পরিপাটিত্বের দিকে বার বার লক্ষ্য করছিল। কোথাও ত্রুটি আছে

কি না সে দিকে নজর দিয়ে তার পরিতৃপ্তি হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল কোথায় যেন ত্রুটি থেকে গেছে।

রাধানাথ পূজো করতে বসে ঠাকুর সেবার নিখুঁত আয়োজন লক্ষ্য করে বলল, প্রথম দিনেই সুন্দর হয়েছে।

বড়ই দেরী হয়ে গেছে মাষ্টার মশাই। বিশাখার কণ্ঠে ক্ষোভের আভাস। রাধানাথ আচমন করতে করতে বলল, অনেক বাড়িতেই পূজা করতে হয়। সবারই দেবতা আমার অপেক্ষায় বসে থাকেন। তাদের ছেড়ে আসতে পারি না।

তা হলে পড়তে বসা হবে না।

রাধানাথ প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, নিশ্চয় বসতে হবে। দেবপূজার সাথে পাঠ-কার্য একই আসনের দাবীদার। কাউকেই বাদ দেওয়া উচিত নয়। কাল থেকে আর দেরী হবে না।

অবিনাশ নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করে দেখছিল বিশাখার কাজকর্ম। বিশাখা যে আগ্রহ নিয়ে দেবসেবা এবং পড়াশোনা করছে তা দেখে অবিনাশ মনে মনে খুশীই হয়েছিল। ভাগ্য বিড়ম্বিতা কন্যার সামনে সহজে সে আসত না। কোন সময় মুখোমুখি হলেই অবিনাশ অপ্রতিভভাবে কোন ছুতানাতায় বৈঠক-খানায় এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচত।

বোধহয় জীবনযাত্রার স্রোত এই পথেই প্রবাহিত হত, বিধাতা অলক্ষ্যে বসে নতুন ইতিহাস রচনার উপাদান সংগ্রহ করছিলেন। সবার অজান্তে বিধাতার বঙ্কিমহাসি চৌধুরীবাড়ির ইতিকথা লেখবার মাল মশলা জুগিয়ে দিল। তিন দিনের জ্বরে অবিনাশ চৌধুরী ধরাধাম থেকে বিদায় নিল। স্রোতের গতি ভিন্নমুখী হল।

মৃত্যুর পূর্বে অবিনাশ বিশাখাকে ডেকে বলল, আর বোধ হয় বাঁচব না কিন্তু দুঃখ নিয়েই মরতে হচ্ছে। তোমাকে সুখী দেখতে পেলাম না।

বিশাখা বাধা দিয়ে বলল, ওকথা তুমি বল না। আমি সুখী হয়েই বাস করছি। তোমার দুঃখ করবার কিছুই নেই আর মরাও এতো সহজ নয়।

সহজ নয়? ক্ষীণ হাসি বেরিয়ে এল অবিনাশের ঠোঁটে। আবার বলল সুখ! তা বটে! নিজেকে বিলিয়ে দিলেই সুখ। শ্যামের পায়ে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে সুখ খুঁজে নিও মা। আমি বুঝতে পারছি মৃত্যু আমার শিয়রে,

দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যকে মনে করে তোমাকে সঁপে দিয়েছিলাম। এই ভ্রমের অভিশাপ আমার মরণেই যেন শেষ হয়।

স্বল্পভাষী বিশাখা আজ মুখর হয়ে উঠল, বলল, সুখ যদি মনের কথা হয় তা হলে আমি আমার সুখ খুঁজে নিতে পারব। সে সুখ শ্যামও দিতে পারবে না। তোমার মৃত্যুতে তার শেষ হবে না, সূত্রপাতও হবে না।

অবিনাশের মৃত্যু পাণ্ডুর মুখে পরিতৃপ্তির রেখা ফুটে উঠল। বিশাখা যে নিজেকে বুঝতে শিখেছে এইটুকুই তার বড় লাভ। আজ সে ভরসা পেল, তার অবর্তমানে বিশাখা নিজেকে টেনে নিয়ে চলতে পারবে। তবুও সে শান্তি পাচ্ছিল না। মনটাই সব নয়, দেহটাও সংসারে একটা বিরাট ভূমিকা গ্রহন করে, সে কথা অবিনাশ বিশ্বাস করে। দেহটাকে বঞ্চিত করে কেবল মাত্র মন নিয়ে বিশাখা বাঁচতে পারবে কি না সেটাই হল গুরুতর প্রশ্ন।

অবিনাশের মৃত্যুর পর বিশাখা রাধানাথকে জিজ্ঞাসা করল, আর কি বাকি রইল? বিশাখার বক্তব্য অস্পষ্ট, রাধানাথ ফিরে তাকালো।

বলছি, বাবা তো গেলেন। আমার আর কি করবার আছে?

নিজেকে গড়ে তোলা।

বিশাখা অতিকষ্টে মনোভাব গোপন করে বলল, বোধ হয় তাই। অনেকক্ষণ নীরবে মাথা নীচু করে থেকে বিশাখা আবার বলল, বাবা মনে করতেন বংশ গৌরব মানুষের বড় পরিচয়, তার চেয়ে বড় পরিচয় জাত্যাভিমান। তাই তিনি খাজা মৈথিলীর সাথে আমার বিয়ে দিয়ে বঙ্গ-মিথিলার মিত্রতা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন, বাংলা আর মিথিলা এক নয়। বাংলার মৈথিলীর সাথে মিথিলার মৈথিলীর যা পার্থক্য সেটা জৈবিক নয়, কৃষ্টিগত। তাই শেষরক্ষা করতে পারেন নি।

রাধানাথ বিশাখার এই প্রসঙ্গ সম্বন্ধে মোটেই আলোচনা করতে ইচ্ছুক নয়। বিশাখার বক্তব্যে যে কষ্টদায়ক বাস্তব উঁকি দিচ্ছিল সেটুকুই তাকে মৌন থাকতে বাধ্য করল। রাধানাথের কাছে থেকে কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে বিশাখা হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠল। শিশুর মতো এই হাসিতে বিশাখা নিজেকে দিবালোকের মতো স্পষ্ট করে তুলল রাধানাথের সামনে। কিন্তু রাধানাথের কোন ভাবান্তর ঘটলো না।

॥ ২ ॥

দুই বছর পর।

সকালে শ্যামের পূজা শেষ করেই রাধানাথ গিয়েছিল টাউনে। বাজার হাট শেষ করে গ্রামে ফিরবার পথে আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামতেই রাধানাথ গয়েশপুরের গোঁসাইদের দরদালানে আশ্রয় নিল। আকাশের যে অবস্থা তাতে বৃষ্টি সত্বর থামবে বলে ভরসা ছিল না, তখনও দু তিন মাইল পথ বাকি। টাউন থেকে যে সংবাদ শুনে এসেছিল সেই সংবাদ যথাস্থানে পৌঁছে দিতে না পারায় রাধানাথ মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠছিল। কিন্তু নিরূপায়। এদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে, দেবপূজার সময় এগিয়ে আসছে। রাধানাথ নিরূপায়ের মত বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ নেমে পড়ল কর্দমাক্ত পথে। বিলম্ব করবার মত ধৈর্য তার ছিল না।

সোজা এসে দাঁড়াল শ্যামের মন্দিরে। বিশাখা প্রদীপে জ্বেলে শ্যামের পূজার ব্যবস্থা করছিল। রাধানাথকে ঐ অবস্থায় দেখে বিশাখা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, এই বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে কেন এলেন মাষ্টার মশায় ?

শ্যামের সেবার দায়িত্ব যে আমার রয়েছে। রাধানাথ কৈফিয়ত দেবার মতো করে কথাগুলো বললেও যাকে লক্ষ্য করে বলল সে কিন্তু এই জবাবে খুশী হল না। অজ্ঞাত কোন কারণে রাধানাথ যে উত্তেজিত তা তার বক্তব্যের মাঝ দিয়ে ফুটে উঠেছিল। বিশাখা কোন প্রশ্ন না করে বলল, পাশের ঘরে কাপড় গামছা আছে, গা-মাথা মুছে কাপড় ছেড়ে নিন। আপনি না আসলেও শ্যামের সেবার কোন ত্রুটি হত না।

তা জানি। বলে রাধানাথ দাঁড়িয়ে রইল। কাপড় বদল করবার কোন আগ্রহ দেখা গেল না। বিশাখা কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের সাথে বলল, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? যান।

রাধানাথ যেন অচল অটল। তার গম্ভীর মুখে প্রদীপের আলো এসে

পড়ছিল। রাধানাথের এমন ভাবাবেগপূর্ণ মুখ বিশাখা কোনদিন লক্ষ্য করেনি, এই মুখাবয়বে কেমন যেন একটি গর্বোদ্ধত ভাব। এর কোন ব্যাখ্যা থাকতে পারে তা ছিল বিশাখার অজানা। কেমন নতুনত্ব বোধ হল তার, জিজ্ঞাসা করল, তবুও দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?

রাধানাথ এবার মুখ খুলল বলল, দ্রোণ বড় হয়েছিল কেন জানো ?

বিশাখা বিস্ময়ের সাথে উত্তর দিল, তাতো জানি না।

অর্জ্জুনের মতো শিষ্য পেয়েছিলো বলে। আজ আমরাও বড় বলে পরিচয় দেবার সুযোগ এসেছে। আমার তোমার সাধনা সাফল্য লাভ করেছে। তুমি প্রবেশিকা পাশ করেছ।

বিশাখা বিশ্বাস করতে পারছিল না। আবেগ কম্পিত স্বরে প্রশ্ন করল, পাশ করেছি ?

হ্যাঁ। এই গৌরব তোমার একার নয়, আমারও।

বিশাখা মৃদুস্বরে বলল, এই বোধহয় প্রথম পাশ।

রাধানাথ চমকে উঠল। বিশাখা কোন দিক লক্ষ্য না করে পাশের ঘর থেকে কাপড় গামছা এনে রাধানাথের হাতে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

রাধানাথ কাপড় বদলে এসে জিজ্ঞাসা করল, তুমি তো কিছু বললে না ?

বিশাখা কোন কথা না বলে মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াল। বিনা কারণে কোশাকুশি খট্‌খট্ করে কি যেন ভাবতে লাগল।

রাধানাথ পূজার আসনে বসে নিজের মনেই বলল, আজ যদি অবিনাশবাবু বেঁচে থাকতেন তা হলে তিনি কত আনন্দ পেতেন। তার দেওয়া কাজ কতটা করতে পেরেছি তা বোধ হয় তিনি বুঝতেন।

বিশাখা কোন জবাব না দিয়ে একপাশে চুপ করে বসে রইল,। রাধানাথ পূজা শেষ করে উঠতে উঠতে বলল, তুমি কি খুশী হতে পারনি বিশাখা ?

বিশাখার পুঞ্জীভূত বক্তব্য হঠাৎ বল্গাহীন অশ্বের মত বেগে ছুটে বের হল। রাধানাথের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, দ্রোণ ব্যর্থ হয়েছিল কেন জানেন ?

বিশাখার প্রশ্ন শুনে রাধানাথ ঘাবড়ে গেল, অসারে বলল, জানিনা তো।

অশ্বত্থমার জননী ছিল না বলে। বক্তব্য শেষ করে ত্বরিতগতিতে টিপি টিপি বৃষ্টির মধ্যে উঠোনে নেমে অন্ধকারে মিশে গেল। রাধানাথের কানের

মধ্যে কে যেন উত্তপ্ত লৌহ শলাকা প্রবেশ করিয়ে দিল। কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের মতো রাধানাথ দাঁড়িয়ে থেকে বুঝতে পারল, বিশাখা বক্তব্য শেষ করে আত্মগোপন করেছে। তখনও বৃষ্টি থামেনি তবুও রাধানাথ অন্ধকারে উঠোনে নেমে পড়ল। অন্ধকারেই এগিয়ে চলল গ্রামের প্রান্তে যেখানে তার ঘর। সারাটা পথ ভাবতে ভাবতে এল, বিশাখার বক্তব্যের মাঝ দিয়ে বিশাখাকে কতটা সে নিজে খুঁজে পেয়েছে। বিগত সাত বছর বিশাখাকে পড়িয়ে এসেছে অক্লান্তভাবে। সাধনা করেছে সাফল্য লাভের, কোনদিন নারী-বিশাখাকে সে দেখতে পায়নি। শিশু শিক্ষার্থী বিশাখাকেই সে চিরকাল দেখেছে। শিশুর সাথে যে ভাবে শিশু মন নিয়ে মিশতে হয় তেমনি ভাবেই মিশেছে। বিশাখা তার কাছে রয়ে গেছে অজ্ঞাত।

ঘরে এসে লণ্ঠন জেলে পুঁথি পত্তর খুলে নিয়ে বসল রাধানাথ। অকল্পনীয় এই ঘটনা তার মনোরাজ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, সে আলোড়ন থেকে বাঁচবার জন্যই সে পুঁথিতে মন দিতে চাইলো।

পুঁথি নিয়ে বিশাখার সাথে মাঝে মাঝে খিটিমিটি হয়েছে। বিশাখাকে গীতা পাঠের উপযোগিতা বুঝিয়ে একখণ্ড গীতা হাতে দিয়ে একদিন আশ্বস্ত মনে ফিরে এসেছিল, ভেবেছিল বিশাখা গীতার সার মাহাত্ম্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পারবে। রাধানাথের এই বাসনা নস্যাত করে দিয়ে পরদিন বিশাখা যখন বলল, গীতা পড়তে ভাল লাগে না মাষ্টার মশাই।

রাধানাথ জিজ্ঞাসা করেছিল, কেন ?

সবই আজগুবি।

ক্ষুব্ধ রাধানাথ আত্মসম্বরণ করে বলেছিল, সমুদ্র মন্থনে অমৃত ও বিষ দুই পাওয়া গিয়েছিল। যার গ্রহন করবার যোগ্যতা ছিল, সে অমৃত পেয়েছিল। আমি বলছি না তোমার গ্রহন করবার যোগ্যতা নেই, তোমার প্রবেশিকা পরীক্ষা হয়ে গেছে, তুমি অফুরন্ত সময় পেয়েছ, ভাল করে গীতা পড়তে থাকো। খুঁজে পাবে অমৃতের সন্ধান।

বিশাখা হেসে বলেছিল, গীতা পড়লে চন্দ্রগুপ্ত নাটক লেখা যায়। মানুষের জীবনে অন্যায় কার্যের সপক্ষে যুক্তি পাওয়া যায়। বাস্তব জীবন তাতে উপকৃত হয় না।

কি বলছ বিশাখা !

আমি বিষ খেয়েছি মাষ্টার মশায়। চন্দ্রগুপ্তকে নন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য যে উত্তেজনা চাণক্য ও মূরা সৃষ্টি করেছে চন্দ্রগুপ্ত নাটকে, সেই উত্তেজনা সৃষ্টি করেছেন শ্রীকৃষ্ণ। অর্জ্জুনকে দিয়ে স্বজন হত্যার উদ্ভট যুক্তি দেওয়া হয়েছে এতে। সবই অবাস্তব কল্পনা। যারা অমৃতপায়ী তাদের সাথে বিষপানকারীর দৃষ্টিভঙ্গী এক হয় কি ?

রাধানাথ যুক্তি দিয়ে বিশাখাকে স্বমতে আনতে আর চেষ্টা করেনি। যেদিন বিশাখা এই কূট যুক্তি উত্থাপন করেছিল সে দিন সেই যুক্তিকে অবহেলা না করে রাধানাথ যদি ভালো করে চিন্তা করে দেখত তা হলে বিশাখাকে জানবার অবসর সে নিশ্চয়ই পেত।

এরই কয়েকদিন বাদে মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ বিশাখা বলল চণ্ডী পড়তে খুব ভাল লেগেছে মাষ্টারমশায়।

যে ব্যক্তিটি কদিন আগে গীতা সম্বন্ধে উদ্ভট যুক্তি দিয়েছিল তাকে হঠাৎ চণ্ডী সম্বন্ধে গদ গদ হতে দেখে রাধানাথ আশ্চর্য হয়ে গেল। শুধু জিজ্ঞাসা করল, কেন ?

মানুষ চায় জয়, প্রতিষ্ঠা আর প্রশান্তি। দেবীর কাছে মানুষ এই প্রার্থনা জানিয়েছেন। বাস্তব জীবনের সাথে চণ্ডীর সম্পর্ক যেন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

রাধানাথ সেদিনও প্রশ্ন করেনি। কিন্তু গভীর ভাবে ভেবে দেখেনি, বিশাখা বাস্তব জীবনের আকাঙ্খা কি করে জানল,। তাই বিশাখা রয়ে গেল তার কাছে অজানা। অষ্টাদশী বিশাখা যে একত্রিশ বৎসর বয়স্ক রাধানাথের চেয়ে বাস্তব সম্বন্ধে বেশী অভিজ্ঞ সে কথা পুঁথির কোন পাতায় লেখা নেই বলেই রাধানাথ বিশাখাকে জানতে চেষ্টা করেনি। যার এতটা দিন কেটে গেছে পুঁথির পাতায় অথবা দেবসেবায় তার সাথে পার্থিব জীবনের যেটুকু ক্ষীণ সম্বন্ধ তা শুধু দেহরক্ষার তাগিদে।

আজ বিশাখা যেন আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল তার পার্থিব জীবনের ব্যর্থতার কারণ। দেহরক্ষাই যে যথেষ্ট নয় একথা ব্যাখ্যা করতে ঐ সামান্য কয়েকটি শব্দই যথেষ্ট।

রাধানাথ মাদুর পেতে শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকে বিগত সাত বছরের কথা। শিশু কি করে কিশোরী হল, কিশোরী কি করে যুবতী হল সে কথাই সে

ভাবতে থাকে আর খুঁজতে থাকে কোথাও কোন ত্রুটি সে ঘটিয়েছে কি না। বোধহয় আজকের এই নাটকীয় ঘটনা ছাড়া মনে রেখাপাত করবার মতো ঘটনা কখনও ঘটেনি। যে সংবাদ পরিবেশনের ভঙ্গী এত বেশী নাটুকে ভাবে করা হয়েছে তাতে রাধানাথের চিত্ত দৌর্ব্বল্য আপনা থেকেই বিশাখার চোখে ধরা পড়েছে। রাধানাথ চিন্তা করে খুঁজে পায় না সত্যই তার চিত্ত দৌর্ব্বল্য আছে কিনা।

রাধানাথ ঘুমিয়ে পড়ে।

কে যেন ডাকল, রাধানাথ!

রাধানাথ চারপাশ ভাল করে তাকিয়ে দেখে আবার চোখ বুঁজল। না কেউ তো নেই। তবে কে ডাকল এই মাঝ রাতে। রাধানাথ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ভাবতে থাকে। আবার সে স্পষ্ট শুনতে পেল, রাধানাথ।

রাধানাথের জিব যেন আটকে গেছে। উত্তর দিতে পারল না। আবার ডাক শোনা গেল।

রাধানাথ!

উঁ।

আমাকে চিনতে পারছ?

না।

সৌম্যমূর্তি ব্রাহ্মণ। গলায় সাদা উপবীত। কাঁধে উড়াণী। মূর্তি হেসে উঠল। জিজ্ঞাসা করল, তোমার বাবা যদুনাথ?

হাঁ।

ঠাকুরদাদা সত্যনাথ?

হাঁ।

তার বাবা আদ্যনাথ?

হাঁ।

আরও ওপরে তাকাও। তোমাকে বাদ দিয়ে অষ্টাদশ পুরুষ ওপরে তাকাও। দরিদ্র ব্রাহ্মণ যোগনাথ এসেছিল গৌড় দুর্গের চত্বরে ভাগ্য অন্বেষণে। যোগনাথ ন্যায়রত্ন। আমি সেই যোগনাথ ন্যায়রত্ন। এবার চিনেছ?

হাঁ।

তুমিই আমার বংশধর। তোমার মত ভুল আমিও করেছিলাম। আজ নয় আজ থেকে পাঁচশত বছর আগে।

পাঁচশত বৎসর!

হাঁ। যোগনাথ এসেছিল ভাতুড়িয়া থেকে। প্রথম আস্তানা তৈরী করেছিল পেঁড়োতে। সুলতান তখন সমাদর করত কৃতী জ্ঞানীদের। সমাদর পেয়েছিলাম কিন্তু পেঁড়ো থেকে রাজধানী সরিয়ে আনলো গৌড়ে, আমি উঠে এসে গৌড়দুর্গের বাহিরে মোরামবিলের ধারে ঘর বাঁধলাম।

ঘরনী বিহীন সে ঘর।

যোগনাথ ন্যায়রত্ন টোল খুলল। শিক্ষার্থী এল। বিদ্যাচর্চা চলল। যোগনাথের বয়স তখন ছাব্বিশ বছর।

ঘর থাকলেও স্থায়িত্ব থাকে না রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। দুর্গের সীমানা থেকে বহুদূরে যেতে হল একবার। মহানন্দা এসে গঙ্গায় মিশেছে সেখানে। ভয়ঙ্কর সেই জলধারার পাশে শান্ত সমাহিত ছোট একখানা গ্রাম। গ্রামের বাসিন্দা প্রায় সবাই ধীবর, দু একঘর ব্রাহ্মণ আর কায়স্থ ছিল। যোগনাথ এসে আশ্রয় নিল মথুরানাথ মজুমদারের বাড়িতে।

মথুরানাথ ব্রাহ্মণ, বিত্তশালী চাষী। গৃহে গৃহিনী ও দুটি নাবালক পুত্র। পুত্র কন্যাদের পরিচর্যা করবার জন্য রয়েছে দূর সম্পর্কীয়া এক শালিকা বয়স তার পঞ্চদশ পেরিয়ে গেছে।

অবিবাহিতা শ্যালিকাকে কি কারণে আশ্রয় দিয়েছিল তা কেউ জানতনা। জানত শুধু একজন, সে হল শ্যালিকা অমৃতময়ী। আর জেনেছিল যোগনাথ। তাও অনেক দেরীতে।

যোগনাথ গঙ্গায় স্নান করে স্বহস্তে রেঁধে খায়। পূজা আর পুঁথি নিয়ে দিন কাটায়। দূর থেকে লোক এসে সংবাদ দেয় গৌড়ের রাষ্ট্র বিপ্লবের অবসান ঘটেছে। এমনি করে কয়েকমাস কেটে গেল।

একদিন উষা কালে যোগনাথ গঙ্গাস্নানের জন্য তৈরী হয়েছে এমন সময় পথ রোধ করে দাঁড়াল অমৃতময়ী।

যোগনাথ জিজ্ঞাসা করল, কে তুমি?

আমি অমৃতময়ী, মথুরানাথের শ্যালিকা।

কিন্তু এখানে কেন?

আশ্রয় খুঁজতে।

ঠিক বুঝতে পারছি না তোমার কথা।

মথুরানাথের হাত থেকে বাঁচতে হবে, তাই আশ্রয় চাইছি।

যোগনাথ মথুর মজুমদারকে সজ্জন ধর্মভীরু বলে জানতো। অমৃতময়ীর কথা শুনে যেন কেমন বেমনা হয়ে গেল। হঠাৎ কোন উত্তর দিতে না পেরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

অমৃতময়ী ফিস্ ফিস্ করে বলল, জবাব দিন। সকাল হয়ে গেছে এখুনি আমি অন্দরে ফিরে যাব। যাবার আগে উত্তরটা শুনতে চাই।

গোপন কোন রহস্য যে রয়ে গেছে তা বুঝতে পেরে যোগনাথ কোন সোজা-সুজি উত্তর না দিয়ে বলল, আমাকে ভাবতে সময় দাও।

সময়। বেশ। স্নান শেষ করে এসে উত্তর দেবেন। আমি ঘাটের পথে দাঁড়িয়ে থাকব।

স্নানান্তে ফিরবার পথ আটক করল অমৃতময়ী। অমৃতময়ীর রূপের আগুনে যোগনাথের চোখ ঝলসে গেল। এই সৌন্দর্যকে আশ্রয় দেবার মত সুরক্ষিত হর্ম্য তার নেই জেনেও বলল, আমি নিজেই আশ্রয়হীন। তবু ভরসা পেলে আশ্রয় গড়ে তুলব।

ঠিক।

ঠিক। কিন্তু বাঁচাটা নিজের হাতে। যে বাঁচতে চায় সে বাঁচতে পারে।

অমৃতময়ী কি বলল, বোঝা গেল না চকিতে সরে গেল।

যোগনাথ ফিরে এসে পূজায় বসল। পূজা তার হোল না। তার কানে ভাসতে লাগল অমৃতময়ীর অমৃতবর্ষী আশ্রয় প্রার্থনার আবেদন। কোন রকমে ফুল বেলপাতা দিয়ে যোগনাথ এসে বসল তার পুঁথি পত্তর নিয়ে। পুঁথির পৃষ্ঠা উল্টে চলেছে যোগনাথ, এক অক্ষরও সে বুঝতে পারছে না। কেমন ঘুলিয়ে যাচ্ছিলো পুঁথি পত্তরের শিক্ষা।

মথুরানাথের প্রাত্যহিক কর্ম ছিল যোগনাথের কাছে এসে কিছুক্ষণের জন্য বসা এবং শাস্ত্র আলোচনা করা। আজও মথুরানাথ এসেছে। জিজ্ঞাসা করল, আজ কি তিথি ন্যায়রত্ন মহাশয় ?

শুক্লা পঞ্চমী।

আজকের গোধুলি লগ্নে বিবাহ সিদ্ধ কি ?

কার ?

আমার।

আপনার ?

আজ্ঞে হাঁ। দ্বিতীয়দার পরিগ্রহের প্রয়োজন হয়েছে। গৃহস্থালী কর্ম আমার স্ত্রীর পক্ষে সামলানো সহজ হচ্ছে না।

পাত্রী স্থির হয়েছে কি ?

হাঁ। যদি বিবাহ সিদ্ধ হয় আজই তার ব্যবস্থা করতে হবে আপনাকেই।

অমৃতময়ীর আবেদন এবং মথুরানাথের বক্তব্য একত্র করে যোগনাথ ভেবে দেখল, অমৃতময়ী এই চক্রান্ত বুঝতে পেরেই আশ্রয় চাইতে এসেছিল। কিন্তু অমৃতময়ীকে আশ্রয় দিতে হলে, কিছু সময়ের প্রয়োজন। সময় পেতে হলে মিথ্যা ভাষণ ভিন্ন পথ নেই। যোগনাথ জ্যোতিষ শাস্ত্র খুলে দিনক্ষণ পরীক্ষা করে গম্ভীর ভাবে বলল, আজ বিবাহ সিদ্ধ নয়। আগামী পরশ্ব গোধুলি লগ্নে বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। আগামী পরশ্ব বিবাহের আয়োজন করুন।

মথুরানাথ স্থান ত্যাগ করল। কিন্তু অনাগত অশান্তির আশঙ্কায় যোগনাথ অস্থির হয়ে উঠল। দিনমান কেটে গেল ঘর বাহির করতে করতে। রাতের অন্ধকার নেমে আসতেই যোগনাথ সন্ধ্যার প্রদীপ নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। অনেক রাতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছে, এমন সময় দরজায় মৃদু আঘাতের শব্দে তন্দ্রা ছুটে গেল। ধীরে উঠে এসে দরজা খুলতেই অমৃতময়ী ছুটে এসে যোগনাথকে জাপটে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল।

মৃদুস্বরে যোগনাথ বলল, চুপ।

আমাকে আশ্রয় দিন।

সামনে ঐযে গভীর বন নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, দেখছ ?

হাঁ।

ঐ বনে তোমায় বাস করতে হবে সাতদিন।

সেখানে নিরাপদে থাকা সম্ভব হবে কি ?

ঘন পল্লব বেষ্টিত ঐযে আম্রকুঞ্জ, ঐ কুঞ্জে লুকিয়ে থাকবে। রাতের বেলায় তোমার আহার্য আমি দিয়ে আসব। আজ থেকে সপ্তম দিনে দুজনে রওনা হব নতুন জীবনের সন্ধানে। মথুরানাথ প্রকাশ করতে পারবে না যে

তুমি পালিয়ে গেছ। আর আমার উদাসীনতা তাকে বুঝতে দেবে না যে আমার সাথে তোমার যোগাযোগ রয়েছে।

ভীতভাবে অমৃতময়ী বলল, যদি ধরা পড়ি।

তার ব্যবস্থা আমি করব।

যোগনাথ অমৃতময়ীকে পোঁছে দিয়ে এল গভীর বনে।

পরদিন যথারীতি মথুরনাথ আসতেই যোগনাথ তালপত্রে লিখিত একটি হিসাব এগিয়ে দিয়ে বলল, বিবাহের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তালিকা।

মথুরানাথ তখন জানতে পারেনি অমৃতময়ীর পলায়ন বৃত্তান্ত, আগ্রহের সাথে তালিকা নিয়ে উঠে গেল।

নিয়ম ভঙ্গ করে মথুরানাথ হন্তদন্ত হয়ে বিকেল বেলায় এসে দাঁড়াল যোগনাথের সামনে। যোগনাথ উদাসভাবে জিজ্ঞাসা করল, কি সংবাদ মজুমদার মশায় ?

এ বিবাহ বোধহয় হবে না।

কেন ?

পাত্রীপক্ষ রাজী নয়। যদি সম্মত হয় তা হলে কাল উপকরণ সংগ্রহ করব।

মথুরানাথ স্থান ত্যাগ করবার পর যোগনাথ নদীর কিনারার বেড়াতে বের হল। দূর থেকে লক্ষ্য করল, মথুরানাথ ধীবরদের নৌকা নিয়ে নদীর কিনারায় কোন কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে। যোগনাথ বুঝতে পারল, অমৃতময়ী নদীতে ডুবে আত্মহত্যা করেছে এই সন্দেহে নদীর কিনারায় মথুরানাথ তালাসী করেছে। যোগনাথ নিজের মনেই হেসে উঠল।

অনেক রাতে কলাপাতায় আহার্য আর ঘট ভর্তি জল নিয়ে যোগনাথ গভীর বনে আম্রকুঞ্জে উপস্থিত হল। ক্ষুৎপিপাসায় অমৃতময়ীর প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত। সারাদিনের শঙ্কা তার মুখে চোখে কাল ছাপ এঁকে দিয়েছে যোগনাথের ইঙ্গিত পেয়ে অমৃতময়ী বেরিয়ে এল গোপন স্থান থেকে।

যোগনাথ খাবার এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ভয় করছে বুঝি ?

বনকে নয়, বনের জানোয়ারকে নয়, মানুষকে।

মথুরানাথ তোমাকে খুঁজতে গেছে নদীর কিনারায়। জেলেরা জাল দিয়ে কিনারা তোলপাড় করেছে।

খাওয়া বন্ধ করে অমৃতময়ী জিজ্ঞাসা করল, তারপর কি হোল ?

কি হল তাতো জানোই। মুখ কালো করে মথুরানাথ ফিরে গেল।

অমৃতময়ী খাওয়া শেষ করে জিজ্ঞাসা করল, এভাবে কতদিন থাকতে হবে।

যতদিন মথুরানাথের সন্দেহের নিরসন না হবে ততদিন।

যোগনাথ ফিরে এল।

ফিরবার সময় মথুরানাথের শোবার ঘরের পেছন দিয়ে আসছিল। মথুরানাথ তার স্ত্রীর সাথে অমৃতময়ীর কথাই আলোচনা করছিল। যোগনাথ চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল তাদের কথা।

বাইরে যেতে তুমি দেখেছ ?

মথুরানাথের স্ত্রী জবাব দিল, হঁ্যা।

তারপর কোন চিৎকার শুনতে পাওনি।

কতকগুলো শেয়ালের ডাক শুনেছিলাম।

তা হলে পেছন থেকে মুখ চেপে ধরে মুছলমানেই নিয়ে গেছে।

ভীতকণ্ঠে মথুরানাথের স্ত্রী বলল, তাহলে উপায় ?

উপায় কিছু নেই। কিল খেয়ে কিল চুরি করতেই হবে। মুছলমান রাজার জাত। তাদের বিরুদ্ধে কথা বলবার চেষ্টা করলে সবংশে নষ্ট হতে হবে।

এইটুকু শুনেই যোগনাথ চলে এল।

যোগনাথ বুঝল মথুরানাথের মনের কোথাও এমন কোন সন্দেহ জাগেনি যাতে অমৃতময়ীর সাথে যোগনাথকে যুক্ত করা যায়। তবুও অপেক্ষা করতে থাকে। অমৃতময়ী নিরুদ্দেশ হবার চারদিন পরে যোগনাথ মথুরানাথকে ডেকে বলল, গৌড় শান্ত। এবার ফিরে যেতে চাই। আবার টোল খুলতে চাই সেখানে, যদি অনুমতি দেন তাহলে রওনা হতে পারি

মথুরানাথ সামান্য আপত্তি জানিয়েছিল। যোগনাথ পুনরায় তার চলে যাবার স্বপক্ষে যুক্তি উত্থাপন করতেই মথুরানাথ রাজি হয়ে গেল।

যোগনাথ অতি বিনীতভাবে বলল, আগামী কাল উষায় রওনা হব। আপনার সাথে হয়ত দেখা হবে না, এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য মার্জনা ভিক্ষা করছি।

যোগনাথের বিনয়ে মথুরানাথ বিব্রত বোধ করছিল। সেও অতি বিনয়ের সাথে বলল, এই গৃহ আপনারই গৃহ, যেদিন যখন ইচ্ছা পদধূলি দিলে কৃতার্থ হব।

সেই রাত্রেই যোগনাথ মথুরানাথের গৃহত্যাগ করল। কেউ জানল না যোগনাথ কোথায় গেল। যোগনাথ সোজা এল সেই আম্রকুঞ্জে। অমৃতময়ীকে ডেকে নিয়ে বলল, আজ রাতেই এ গ্রামের এলাকা থেকে কম পক্ষে পাঁচ ক্রোশ দূরে পৌঁছাতে হবে। পারবে তো ?

অমৃতময়ী উত্তেজিতভাবে বলল, নিশ্চয়ই।

অন্ধকার রাতে দুজনে আকাশের নক্ষত্রকে পথপ্রদর্শক করে চলতে লাগল। হঠাৎ যোগনাথ জিজ্ঞাসা করল, দিনের বেলায় লোকে যখন জিজ্ঞাসা করবে তোমার পরিচয় তখন কি জবাব দেবে ?

অপ্রতিভভাবে অমৃতময়ী বলল, আপনি বলে দিন কি বলতে হবে।

যোগনাথ জবাব দেবার মত শব্দ খুঁজে না পেয়ে নীরবে চলতে লাগল।

অমৃতময়ী কিছু দূর চলবার পর জিজ্ঞাসা করল, রাত শেষ হয়ে এসেছে। আকাশে ধ্রুবতারা দেখা যাচ্ছে কিন্তু আপনার প্রশ্নের উত্তর তো আপনি দেননি।

তাইতো ভাবছি। ধর্মগত অথবা আইনগত পরিচয় দেবার পথ এখনও বন্ধ রয়েছে।

তা হলে কোতোয়ালের হাতে পড়তে হবে।

পরিচয় সৃষ্টি করা সম্ভব কিন্তু তার স্বপক্ষে প্রমান প্রয়োগ সম্ভব নয়।

তা হলে ?

দিনের বেলায় কোন বনে আশ্রয় নিতে হবে। রাতের বেলায় পথ চলতে পারলে তৃতীয় দিবসে গৌড়ে পৌঁছাতে পারব। সেখানে আমার নিজগৃহ রয়েছে। গৃহে স্থান পেলে গৃহিনীর মর্যাদা সৃষ্টি করতে অসুবিধা হবে না।

তৃতীয় দিবস শেষ রাতে দুজনে মোরাম বিলের ধারে ভগ্নপ্রায় কুটিরে উপস্থিত হল। যোগনাথ সহাস্যে অমৃতময়ীর হাত ধরে কুটিরে প্রবেশ করে বলল, এই আমার গৃহ। এই গৃহের দায়িত্ব রইল তোমার। আগামী কাল শুভলগ্নে ধর্মগত এবং আইনগত পরিচয় সৃষ্টি করে নেব।

সকাল বেলায় অমৃতময়ী গৃহ মার্জনা শুরু করল, যোগনাথ দুর্গের ফটকে

এসে অপেক্ষা করতে লাগল দুর্গ প্রবেশ করবার অনুমতির জন্য। দুর্গ অভ্যন্তরে গিয়ে পুরোহিত ও উপকরণ সংগ্রহ করে আজই সে বিবাহ কার্য সমাধা করতে চায়।

দুর্গ দ্বারে খুলতে এক প্রহর বেলা অতিক্রান্ত হল। প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং পুরোহিত সংগ্রহ করতে দিনের আলো প্রায় নিভে এল। ত্বরিতে স্বগৃহে উপনীত হয়ে যোগনাথ নিজের বিবাহের জন্য নিজেই প্রস্তুত হয়ে নিল।

মোরাম বিলের ধারে যোগনাথ সংসার পেতে বসল।. নগরে ধীরে ধীরে প্রচার হল, যোগনাথ ন্যায়রত্ন ফিরে এসে আবার টোল খুলেছেন। এই সংবাদের সাথে আরও সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল, যোগনাথ ন্যায়রত্ন এবার সস্ত্রীক এসেছেন। কয়েক দিনের মধ্যেই শিষ্য শিক্ষার্থী আসতে আরম্ভ করল। টোল হয়ে উঠল জমজমাট।

যোগনাথ থেমে গেল।

রাধানাথ চিৎকার করে উঠল, তারপর ?

সৌম্যদর্শন ব্রাহ্মণের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। হাসতে হাসতে বলল, খুবই রমনীয় লাগছে এই কাহিনী, নয় কি ? যা রমনীয় তা চিরস্থায়ী হয় না। সৌন্দর্যের বিকাশ যেমন আছে, তেমনি তার নিষ্প্রভ পরিণতি রয়েছে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

যোগনাথ স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল। কপালের রেখাগুলো কুঞ্চিত হল। কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল যোগনাথ।

রাধানাথ জিজ্ঞাসা করল, এই শেষ ?

শেষ ? তা বটে। শেষ কি কিছুর আছে। আপাতদৃষ্টিতে যা অন্ত তার সম্যক উপলব্ধি আমাদের নেই বলেই অন্ত মনে করি। শেষ এখানে নয় আরও দূরে, বরং বলতে পার অয়মারম্ভ।

যোগনাথ পড়েন ও পড়ান। রাত জেগে শাস্ত্রের টীকা লেখেন। অধিক রাতে প্রদীপ নেভাবার আগে ঘুমন্ত অমৃতময়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে মমতা অনুভব করেন। সারাদিন গৃহকর্ম সম্পাদন, শিক্ষার্থীদের আহার্য ব্যবস্থা সমাপন করে ক্লান্ত অমৃতময়ী অসারে ঘুমোয়, তাকে ডেকে তুলতে কষ্ট অনুভব করেন পণ্ডিত শিরোমণি। কোন কোন দিন শেষরাতে ঘুম ভাঙলে অমৃতময়ী উঠে এসে যোগনাথকে ডেকে তোলে। পঞ্চমুখ হয়ে কত কথা বলবার জন্য

অমৃতময়ী প্রস্তুত হয়, সদ্য নিদ্রোত্থিত যোগনাথ বিরক্তি অনুভব করে। মনের বিরক্তি মাঝে মাঝে বাইরে প্রকাশও পায়। প্রকাশভঙ্গী ক্রমে ক্রমে তিক্ত হয়ে ওঠে। অমৃতময়ী বুঝতে পারল, সে আশ্রয় পেয়েছে, অবলম্বন পায়নি।

অমৃতময়ী কথা বলত কম। মনের বেদনা কখনও প্রকাশ পেত না। নীরবে মাথা গুঁজে গৃহস্থালী কাজ করত। হয়ত কোন দিন আবেগের সাথে বলত, চলো একবার আমার বাবা-মায়ের সাথে দেখা করে আসি।

যোগনাথ মনে করত অমৃতময়ীর পিতৃগৃহে যাবার বাসনা নারীসুলভ দুর্বলতা। সে যদি বুঝতে পারত যে অমৃতময়ী তাকে একান্ত নিজস্ব করে পেতে চায় এবং তারই জন্য নিত্যকার কার্যতালিকা থেকে দূরে টেনে নিয়ে যেতে চায় তা হলে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচতে পারত।

বিধাতার ইচ্ছা তা নয়।

একদিন এসে বলল, শাস্ত্র আর শিষ্য এইতো তুমি জানো। আরেক জনকে জানাবার সময় এসেছে।

যোগনাথ তালপত্র থেকে মুখ না তুলেই বলল, তাকেও জেনেছি।

কে সে বল দেখি ?

তুমি। বলে যোগনাথ মুখ তুলতেই অমৃতময়ী লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল।

অমৃতময়ী ক্ষীণকণ্ঠে বলল, আমি নয়, তুমি।

যোগনাথ আশ্চর্য হয়ে বলল, আমি ?

হাঁ তবে নতুন দেহে নতুন পরিচয় নিয়ে।

তৈলাধার পাত্র এবং পাত্রাধার তৈলের উপাসক যোগনাথের যোগভঙ্গ হল। অমৃতময়ীর ক্ষীণকণ্ঠে মাতৃত্বের ভাবী সম্ভাবনার ইঙ্গিত শোনা গেল।

যোগনাথ চিন্তিত হল। বলল, তবে তো বিপদ।

বিপদ! কি বলছ!

ও তুমি বুঝবে না।

অমৃতময়ী দ্বিরুক্তি না করে গৃহাভ্যন্তরে চলে গেল।

মাস যেতে না যেতেই একদিন অমৃতময়ী পিছনে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি লিখছ ?

যোগনাথ তখন কামসূত্রের টীকা লিখছিলেন। অমৃতময়ী কেন যে এসেছে

জানবার চেষ্টা না করে তালপত্রে মুখ রেখেই জবাব দিল, কামসূত্রের টীকা লিখছি। এই টীকা হবে বঙ্গ-বিদ্বান সমাজের শ্রেষ্ঠদান।

ক্ষুন্নভাবে অমৃতময়ী বলল, টীকাই লিখতে পার। সূত্রটা জানতে শেখনি।

যোগনাথ হতভম্বের মত জিজ্ঞাসা করল কি বলছ তুমি ?

না, কিছু না। আমি জানতে এসেছি, আগামী অমাবস্যায় শিব স্থাপন করলে কেমন হয়! তোমার এতে আপত্তি আছে কি ?

যোগনাথ বলল, আমার আপত্তি থাকবে কেন ? তুমি যাতে পরিতৃপ্তি পাও তাতে আমার আপত্তি থাকবে কেন ?

অমৃতময়ী মৃদুকণ্ঠে বলল, শেষ অবধি সহ্য হবে তো।

খুব হবে। এখন যাও দেখি, আমার কাজটা শেষ করি।

অমৃতময়ী ফিরে গেল তার কাজে। যোগনাথ নিজের অজ্ঞাতে যে প্রতিশ্রুতি দিল তার ভয়ঙ্কর পরিণতির জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

রঘুনাথ সুলতান সরকারের রাজস্ব বিভাগের কর্মচারী। তারই পুত্র নারায়নদাস আসত পড়তে। পাঠ্য বিষয় ছিল কাব্য আর স্মৃতি। নারায়ণ মেধাবী ছাত্র। দুই বৎসরে কাব্যের পাঠ শেষ করে স্মৃতির শিক্ষা গ্রহণ করছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে নারায়নদাস ছিল যোগনাথের প্রিয় ছাত্র। তার মেধা এবং যোগনাথের অভাব মোচনের জন্য অযাচিত সাহায্য এই দুইটি মিলে যোগনাথের কাছে নারায়নদাসের স্থান ছিল শ্রদ্ধাপূর্ণ স্নেহের। যোগ নাথের গৃহে ছিল নারায়নদাসের অবাধগতি। পাঠান্তে নারায়ণদাস কাঠ কেটে দিত রন্ধনের উপযোগী করে, সায়াহ্নে গুরু পত্নীর সাথে তরকারী ক্ষেতে গাছ গাছরা লাগাতো। অন্যান্য শিক্ষার্থীদের আহার্যের ব্যবস্থা ছিল যোগনাথের গৃহে। নারায়নদাস থাকতো দুর্গে পিতা মাতার স্নেহচ্ছায়ে তার আহার্যের প্রয়োজন হত না। তবুও কোনদিন ভালমন্দ রান্না হলে অমৃতময়ী নারায়নদাসকে খাবার আমন্ত্রণ জানাতো।

বিংশবর্ষীয় নারায়নদাস এবং অষ্টাদশ বর্ষীয় অমৃতময়ীর আলাপ আলোচনা ও চলাচলের মধ্যে কোনরূপ গর্হিত আচরণ কেউ কখনও দেখেনি। যোগনাথ কখনও চিন্তাও করেনি কোন গর্হিত জীবনের সূত্র রয়েছে উভয়ের আচার আচরণে।

অমৃতময়ীর কোলে এসেছে নধরকান্তি শিশু। যোগনাথ শিশুর জন্মক্ষণ নিয়ে রেখাপাত করে স্থির করল, নবজাত সন্তান মাতৃহারা হবে।

আপন করে ভাববার মতো সঙ্গী পেয়ে, অমৃতময়ী কিছুটা সান্ত্বনা খুঁজে পেল। অবসর সময়ে শিশুকে যোগনাথের কোলে তুলে দিত।

যোগনাথ শিশুকে কোলে নিলেই কেমন যেন বেমনা হয়ে পড়ত। বলত, তুমিই ওকে রাখো। কখন কোথায় লেগে যাবে।

ক্ষুন্নমনে অমৃতময়ী শিশুকে বুকের সাথে জাপটে ধরে ফিরে চলে যেত।

শিশু শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পেতে থাকে।

শিশু হাসে, অমৃতময়ী হাসে।

শিশু হাঁটে, অমৃতময়ী তালে তালে পা ফেলে।

যোগনাথ তার শাস্ত্র আর ছাত্র নিয়ে ডুবে থাকে।

শিশু প্রথম বৎসর অতিক্রম করল। যোগনাথ তার নাম দিল বিভূনাথ।

নারায়নদাসের স্মৃতি পাঠ শেষ হয়েছে।

যোগনাথকে প্রণাম করে নারায়নদাস বলল, আশীর্ব্বাদ করুন যেন জীবন যুদ্ধে জয়ী হই।

শিষ্যের জয় গুরু চিরকাল কামনা করে। আশীর্ব্বাদ করেছিল যোগনাথ।

নারায়নদাস গুরুগৃহ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে গেল দুর্গের গৃহে। পাঠ্য জীবন তার সমাপ্ত হয়েছে। জীবনে নারায়নদাস প্রতিষ্ঠা লাভ করুক, এই কামনা ছিল যোগনাথের। নারায়নদাস বিদায় নিয়ে ফিরে যাবার সময় যোগনাথ বলেছিল, মাঝে মাঝে এস কিন্তু।

নারায়নদাস মাঝে মাঝে আসত।

যোগনাথ পাঠ ও পাঠার্থী নিয়ে ব্যস্ত থাকত। নারায়নদাস শিশুকে নিয়ে খেলত, অমৃতময়ীর সাথে গল্প করতো, তরকারীর বাগান তদারক করত, অন্যান্য শিষ্যদের আদর্শ শিক্ষার্থী হবার উপদেশ দিত। এমনি ভাবেই দিন চলছিল।

একদিন শেষ রাতে বিভূনাথের ক্রন্দনে যোগনাথের ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে এসে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেখল, বিভূনাথ নিরঙ্কুশ ভাবে কাঁদছে, অমৃতময়ী

তার শয্যায় নেই। যোগনাথ ভাবল, বোধহয় বাহিরে কোথাও গেছে, এক্ষুনি এসে যাবে। তাই শিশুকে কোলে নিয়ে আদর জানাতে লাগল।

রাত্রি শেষ হয়ে গেল। অমৃতময়ী ফিরে এল না। শিশুকে কোলে নিয়ে যোগনাথ বের হল অমৃতময়ীর সন্ধানে। বৃথাই অনুসন্ধান। অমৃতময়ী আর ফিরে এল না।

দুর্গে রঘুনাথের কাছে সংবাদ পাঠানো হল। নারায়নদাসকে ডাকতে গেল একজন নবীন শিক্ষার্থী। ফিরে এসে সে জানালো, গতরাতে নারায়নদাস রাজকার্যে রাজমহল চলে গেছে। আসতে বিলম্ব হবে।

রঘুনাথ সংবাদ শুনে চিন্তিত হল। অবিলম্বে নারায়নদাসের সংবাদ আনতে স্থলপথে তুরুক পাঠাল রাজমহলের পথে।

দুদিন পরে তুরুক এসে জানালো নারায়নদাস একটি মহিলাকে নিয়ে রাজমহল ছেড়ে চুনারের দিকে চলে গেছে।

যোগনাথ থেমে গেল।

রাধানাথ চিৎকার করে উঠল, কি বলছেন আপনি ?

রমনীয় কাহিনীর তলায় যে গরল তাই মন্থন করে উপহার দিচ্ছি তোমাকে। আজকের কথা নয়, আজ থেকে পাঁচশত বছর আগে এমনি এক বর্ষাক্লান্ত দিনে আমিও চিৎকার করে উঠেছিলাম। আমার চিৎকারে শিশু বিভূনাথ আঁতকে উঠেছিল। সেদিনকার সেই যোগনাথ ন্যায়রত্ন যে ভুল করেছে। সে ভুলের রক্ত তার বংশধরদের ধমনীতেও বইছে।

কিন্তু !

কিন্তু নেই রাধানাথ। পৃথিবী হল সর্বংসহা তাই তোমার আমার পক্ষে যা অসহনীয় ধরিত্রী তাকে সহনীয় বলে আশ্রয় দেয়। তাও ভাল। এতেও যদি শেষ হত তা হলে যোগনাথ যোগভ্রষ্ট হত না। মানুষ যদি ভবিষ্যৎ দেখতে পেত তা হলে ভ্রম সংশোধন করবার প্রয়োজন হত না অঙ্ক কষে দেখেছিলাম, বিভূ মাতৃহারা হবে। মাতৃহারার সংজ্ঞা সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান ছিল না। মা থেকেও বিভূনাথ মাতৃহারা হয়েছিল। অনেক দিন ভেবেছি নারী জীবনের অপরিতৃপ্তি মাতৃত্বকে গলা টিপে মারতে পারে কি ? পারে, নারীত্ব যে মাতৃত্বের অনেক উপরে। যারা মাতৃত্ব নারী জীবনের পরিণতি মনে করে তারা ভুল করে, অবলম্বনহীন মাতৃত্ব নারীত্বের যাত্রা পথে

তুচ্ছ প্রমানিত হয়। অমৃতময়ী চেয়েছিল যোগনাথের রাজ্যে একনায়ত্ব, তা সে পায়নি, পেয়েছিল দায় বহন করবার নিয়ন্ত্রিত রসদ। তাই অমৃতময়ী অমৃতের সন্ধানে বের হয়েছিল।

যোগনাথ নীরবে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। হঠাৎ ডাকল, রাধানাথ।

উঁ!

আর শুনবে?

আর শুনতে চাইনা। কল্পনায় যাদের মহিমার উচ্চ শিখরে বসিয়ে রেখেছি, তাদের মাটির মানবের অবয়বে দেখতে চাইনা।

এও তোমার ভুল। যারা দেবতার আসনে থাকে তারা মাটির মানুষের পর্যায়ে কখন নেমে আসে না। মাটির মানুষ আয়নায় নিজের মুখ দেখে ভীত হয় না, কিন্তু যারা তার রক্তমাংসের চেহারা দেখে তারাই ভীত হয়। মহিমার উচ্চ শিখরে বসাবার আগে মানুষকে মানুষের মন নিয়ে বিচার কর।

রাধানাথ ঝিমিয়ে গেল।

রাধানাথ!

বলুন।

তবে শোন।

সংবাদ এল যোগনাথের কাছে। অমৃতময়ীকে নারায়নদাস বিবাহ করেছে চুণারের ফৌজদারী মসজিদে মুসলমান ধর্মমতে। অমৃতময়ী ডুবে গেল বিস্মৃতির অন্তরালে। যোগনাথ পুঁথিপত্তর নিয়ে চলে এল মোরামবিলের কিনারা থেকে। নতুন আস্তানা গড়ে তুলল কোতোয়ালীর উপকণ্ঠে মহানন্দার তীরে। শিশু বিভুনাথ এল তার সাথে। আবার কুটির গড়ল যোগনাথ। আবার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। যোগনাথ নতুন টোলের উদ্বোধন করল কোতোয়ালীর নদীর কিনারায়। এও এক নতুন জীবন।

তারপর কত বছর কেটে গেছে হিসাব করে বলা কঠিন। পাঁচ বছর তো বটেই। নতুন কোতোয়াল এল জামান খাঁ। রাজা উজিরের সাথে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক সেদিন মোটেই ছিল না। সাধারণ মানুষ এসব ব[illegible]দলকে স্মরণ করত বদলী মানুষের অত্যাচারের মাপ কাঠিতে।

জামান খাঁর সাথে এল কয়েক শত হাবসী। খোলা তলোয়ার তাদের

হাতে। সূর্যের আলোতে চক চক করে সেগুলো। হাবসীরা এসেই ঘর সংসার গুছিয়ে নিতে থাকে। হিন্দুরা পালাতে থাকে দলে দলে। স্ত্রী-কন্যার ইজ্জত বাঁচাতে ছুটতে থাকে তারা। রাজা উজির বদবদলের কলঙ্ক অঙ্কিত হল সাধারণ মানুষের মনে। রাজা থেকেও তখন অরাজক অবস্থা।

যোগনাথ প্রত্যুষে যেত স্নানে। ফিরে এসে স্বহস্তে রন্ধন শেষ করে নিজে খেত বিভুনাথকে খেতে দিত। তারপর বসত তার শাস্ত্র গ্রন্থ নিয়ে। এই ছিল তার নিত্য কর্ম। এর বাহিরে কোন পৃথিবী আছে সে কথা সে ভুলেই গিয়েছিল।

নতুন কোতয়াল আসবার পর বেগমরা মাঝে মাঝে বিকেল বেলায় আসত নদীতে গা ধুতে। সামিয়ানা টাঙ্গানো হত, বনাত দিয়ে ঘেরা হত বেগমদের স্নানের জায়গা। কোন কোন দিন কোতোয়াল জামান খাঁও আসত জলক্রীড়া দেখতে। সাথে আসতো খোলা তলোয়ার হাতে হাবসীর দল।

স্নানের ঘাটের পাশেই ছিল যোগনাথের কুটির।

সেদিন সামিয়ানা টাঙ্গানো হয়েছে, বনাত খাটানো হয়েছে ; বেগমরা স্নানে নেমেছে নদীতে। দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে হাবসীর দল। কেমন একটা হট্টোগোল শোনা যেতেই যোগনাথ বেরিয়ে এল কুটির থেকে। ধীরে ধীরে এগিয়ে এল নদীর ঘাটে। হাবসীদের কচ্‌কচানি থেকে বুঝতে পারল, কোতোয়ালের চৌথী বেগম পা পিছলে গভীর জলে ভেসে গেছে।

বর্ষার নদী। দুকুল ফেঁপে উঠেছে। খরস্রোতে তৃণখণ্ডও টুকরো টুকরো হয়ে যায়, এমনি অবস্থা নদীর। সবাই জলের দিকে চেয়ে আছে, কিন্তু কোথাও বেগমের কোন চিহ্ন নেই। সবার মুখেই আতঙ্কের চিহ্ন, সবাই ছোটাছুটি করছে। বনাতের ভেতর থেকে ভেসে আসছে বাঁদিদের কান্নার রোল। সংবাদ পাঠানো হয়েছে জামান খাঁর কাছে।

যোগনাথ লক্ষ্য করে দেখল, কিছু দূরে সবুজ রং-এর কি যেন ভেসে উঠে ডুবে যাচ্ছে। যোগনাথ ঝাপিয়ে পড়ল সেই উত্তাল তরঙ্গময়ী নদীর বক্ষে। যোগনাথ ভুল করেনি। সত্যিই চৌথী বেগম স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছিল। সাঁতরে গিয়ে জাপটে ধরল তাকে। টানতে টানতে নিয়ে এল ভাটিতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত যোগনাথ বেগমকে বুকের সাথে জাপটে ধরে

যখন কিনারায় উঠে এল তখন সূর্য ডুবে গেছে, গোধূলির শেষ আলোকণা নদীর জলে সামান্য লালিমার ছোঁয়াচ বুলিয়ে দিয়েছে।

যোগনাথ বেগমের মুখের দিকে তাকিয়ে হতজ্ঞানের মত বসে পড়ল।

সম্বিত ফিরে পেয়ে যোগনাথ বেগমের জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করতে লাগল। কয়েক দণ্ড পরিশ্রম করে যখন বেগম চোখ খুলল, তার দৃষ্টিতে. তখনও আতঙ্ক। বেগম জিজ্ঞাসা করল, আমি কোথায় ?

যোগনাথ বলল, নদীর কিনারায়, বোধহয় মঙ্গলাহাটের কাছে আমবাগানের পাশে।

বেগম চোখ বুঁজে পাশ ফিরে শোয়। যোগনাথ চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করল, আমায় চিনতে পার বেগম ?

বিস্মিত চোখ দুটি যোগনাথের মুখের ওপর কয়েক মুহূর্তের জন্য স্থাপন করে বেগম দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

যোগনাথ ডাকল, অমৃতময়ী।

ক্ষীণ আওয়াজ বেরিয়ে এল বেগমের গলা থেকে, অমৃতময়ী মরে গেছে, এখনও বেঁচে আছে জামান খাঁর চৌথী বেগম আসমান। তাও হয়ত থাকত না।

যোগনাথ কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাইতেই আসমান হাত তুলে নিষেধ করল। গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে থাকে নদীর কিনারায়। যোগনাথ চুপ করে বসে রইল আসমানের পাশে। আকাশে দশমীর চাঁদ, রূপোর রূপে রূপময় হয়েছে জল, বাঁশ বাগানের মাথায় আলোর খেলা। শন্ শন্ করে উঠছে কিনারার জঙ্গলী গাছের ঝোপ। যোগনাথের চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতীত জীবন। ব্যথা বেদনার মমত্বহীন পরিণতির জন্য যোগনাথ যেন প্রস্তুত হয়ে নিল।

এবার হাঁটতে পারবে ?

না।

একা যদি থাকতে পার তা হলে দুধের চেষ্টা করতে পারি।

একা। বেশ। নাঃ। তুমি যেওনা। আমাকে ফিরিয়ে নিতে এখুনি ফৌজ এসে যাবে। দুধের দরকার হবে না।

বেশ।

সত্যিই দেখা গেল সারিবদ্ধ কয়েকখানা ডিঙ্গি মশাল জ্বালিয়ে ভাটিতে নেমে আসছে। যোগনাথ বলল, কোতোয়ালের ফৌজ আসছে।

আসমান যন্ত্রণায় মুখ ফিরিয়ে নিল।

যোগনাথ গিয়ে দাঁড়াল জলের ধারে। হাত তুলে চিৎকার করতে লাগল ডিঙ্গি বাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে।

শিবিকাসহ ডিঙ্গি ভিড়ল কিনারায়। কয়েকজন হাবসী প্রহরী নিয়ে নেমে এল স্বয়ং জামান খাঁ। জামান খাঁর চেহারায় ফুটে উঠেছে চৌথী বেগমের মর্যাদা।

যোগনাথ করজোড়ে নিবেদন করল বেগমের জীবন লাভের কথা।

ইঙ্গিতে প্রহরীরা শিবিকা নিয়ে গেল বেগমের কাছে।

জামান খাঁ জিজ্ঞাসা করল, কোথায় থাক তুমি?

হুজুরের এক্তিয়ারে, কোতোয়ালীর ঘাটে।

জান কোরবান করে তুমি বেগমকে বাঁচিয়েছ, বকশীশ হবে।

হুজুরের মেহেরবানী।

চলো আমার ডিঙ্গিতে। কাল সরকারে হাজির হবে।

কোতোয়ালের সাথে যোগনাথ ফিরে এল নিজের আস্তানায়। একবার অমৃতময়ীকে দেখবার ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু বেতমিজের মত কিছু করলে শিরশ্ছেদ নিশ্চিত জেনে চুপ করেই ছিল।

পরের দিন সরকারে হাজির হতেই কোতোয়াল নিজে এসে অভ্যর্থনা জানালো। ফরমান জারি হল, একশত বিঘা জমির দানপত্র লিখে দেওয়া হল যোগনাথের নামে।

যোগনাথকে পাশে বসিয়ে কোতোয়াল জিজ্ঞাসা করল, শুনলাম তুমি নাকি চিকিৎসক!

চিকিৎসা বিদ্যা যোগনাথের কুষ্ঠিতে নেই, বুঝতে পারল আসমান নতুন খেলা শুরু করেছে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ভুলে গেছি চিকিৎসা বিদ্যা।

কোতোয়াল হেসে বলল, যে শেখে সে সহজে ভোলে না, তুমি চিকিৎসা করতে চাওনা, এই তো?

হাঁ হুজুর। মেয়েদের চিকিৎসা গুরুর নিষেধ।

আমার অনুরোধে একবারের জন্য এই নিষেধ ভঙ্গ করতে হবে।

হুজুর, আমি ব্রাহ্মণ, যদি গুরুর নিষেধ অমান্য করি একবারের জন্যও তাহলে চিকিৎসা কার্য থেকে বঞ্চিত হব।

তাতেও আপত্তি নেই। চৌথী বেগমের চিকিৎসা তোমাকে করতেই হবে। তারপর তুমি কারও চিকিৎসা যদি নাও কর তাতেও দুনিয়ার কিছু এসে যাবে না। দুনিয়াতে বেগমের কিমত অনেক বেশী!

যোগনাথ যেন নিরুপায়ের মত স্বীকার করে নিল কোতোয়ালের আদেশ।

হারেমে চৌথী বেগমের ঘরে উপস্থিত হয়ে বুঝতে পারল, অমৃতময়ী নতুন খেলা শুরু করেছে। চুপি চুপি বলল, তোমার খেলায় আমাকে টেনে এনেছ কেন? শমন মাথায় করে এসেছি, জানো।

তোমার সাথে অনেক কথা রয়েছে। সেদিন বলবার সামর্থ্য ছিল না, অথচ দেখা করবার সুযোগও বর্তমানে নেই। তাই কোতোয়ালকে ভোলাতে হয়েছে। আমার কপাল, নইলে তুমি যদি বলতে চিকিৎসা জানোনা তা হলে দেখা আর হতনা।

যোগনাথ অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মত নাড়ী টিপে ধরে বলল, কি তোমার বলার আছে বলতে থাক।

সে তো একদিনে শেষ হবেনা। ধীরে ধীরে বলতে হবে। যেদিন বলা শেষ হবে সেদিন আমিও নীরোগ হব, তোমাকেও আসতে হবে না।

যোগনাথ ভীতভাবে বলল, এই সুরক্ষিত প্রাসাদে আমাকে বার বার আসতে হবে? —জীবন নিয়ে ফিরতে পারব তো?

কোন ভয় নেই। অমৃতময়ীর অমৃতের সন্ধান যে পেয়েছে সে কোন ত্রাস সৃষ্টি করবে না একথা নিশ্চিত জেনে রাখো।

যোগনাথকে পর পর সাত দিন আসতে হল। শেষের দিন অমৃতময়ী বলল, জামান খাঁকে ডেকে পাঠাই। তাকে বলি, তোমার চিকিৎসায় আমি আরাম হয়েছি, তা হলে নতুন বখশীশ পাবে।

যোগনাথ বাধা দিয়ে বলল, তোমার যা করবার কর কিন্তু আমার সামনে নয়। (অভিনয় অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে আর নয়।

যোগনাথ ফিরে এসে কয়েকদিন ধরে ভেবেছে অমৃতময়ীর কথা। নারায়নদাস তাকে বিয়ে করে নিয়ে গিয়েছিল দিল্লির বিলাস বৈভবের মাঝে।

রঙীন পাখীর পাখনা খুলেছে তা সে বুঝতে পারেনি। তাই জল্লাদের খড়্গে তার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, আর আসমান মিশে গিয়েছিল সুলতানী হারেমে কুড়িয়ে পাওয়া হাজারো পাখনা ওঠা পাখীর সাথে। অমৃতময়ী বুঝেছিল, জীবনকে ভোগ করতে নেমে নীতির বাঁধনকে মূল্যদান মূর্খতা মাত্র। ভোগের বস্তুকে সামনে রেখে সাত্ত্বিক ভাবাবেগ ভোগ্য বস্তুর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তাই যেদিন তার মনে হল সুলতানী প্রেম রূপসীর মনে আঁচড় কাটে না, শুধু দেহকে ক্ষতবিক্ষত করে, সেইদিনই সুযোগ বুঝে আশ্রয় নিয়েছিল জামান খাঁর হারেমে। সুলতানের উচ্ছিষ্ট নারীকে শয্যাসঙ্গিনী করবার গৌরব জামান উপেক্ষা করতে পারেনি। সুলতানের কাছ থেকে ফরমান নিয়ে জামান খাঁ তার চার বিবি সহ কোতোয়ালের চাকুরি নিয়ে দিল্লি থেকে পাড়ি জমিয়ে ছিল বাংলায়। এর পশ্চাতে আসমানের হাত কতটা ছিল বলা মুস্কিল কিন্তু গুজরাটের নায়েবী চাকরি ছেড়ে বাংলার কোতোয়ালের চাকরি গ্রহন করার পেছনে আসমান যে রয়েছে, একথা অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই।

আসমান বলেছিল, তুমি আমি অনেক দূরে রয়েছি, শুধু দূরে নয়, তোমার মনে কঠিন আঘাত দিয়েছি। এ আঘাত তোমার প্রাপ্য ছিল কি না তা ভাল করে ভেবে দেখো। হয়ত মনে করছ আমি পাপী, হৃদয়হীনা কিন্তু হৃদয়হীনা যারা তারা অপরের হৃদয় দেখতে পায় না।

কিন্তু সন্তান ?

ও সন্তান তোমার। তাই তোমার গচ্ছিত রত্ন তোমাকেই দিয়ে গেছি। ভেবেছিলাম, ঐ সন্তানও তোমার মত হৃদয়হীন হবে তাই ওকে পরিত্যাগ করেছিলাম। তোমার কাছে আশ্রয় চেয়েছিলাম, আশ্রয় তুমি দিয়েছিলে। তোমার কাছে পরিচয় চেয়েছিলাম, পরিচয় তুমি দিয়েছিলে কিন্তু দাও নাই অতি নগন্য একটি বস্তু, সেইটি হল হৃদয় ভরা আবেদন।

যোগনাথ কেঁপে উঠেছিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে, আর চিকিৎসকের অভিনয় করতে আসমানের কাছে আসবে না কিন্তু পারেনি। কেবলমাত্র হৃদয়ের দুর্বলতা নয়, কোতোয়ালের রক্ত চক্ষুর ভয়ে। আসমানের ইঙ্গিতে যোগনাথ-কেও হয়তবা নারায়নদাসের মত পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে। মৃত্যুতেই তো সব শেষ নয়, যদি শেষ হত তা হলে ভাবনার কিছু ছিল না, কিন্তু তা

নয়, পেছনে পড়ে থাকবে বিভুনাথ। অসহায় বালকের পক্ষে বেঁচে থাকা হবে মরণাধিক যন্ত্রনাদায়ক।" নিজের গর্ব্ব ও জেদ বজায় রাখতে শিশুকে অসহায়ভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে সে চায় না। তাই পর পর সাতদিন তাকে আসতে হয়েছে। যা ছিল তার নিজস্ব সম্পদ, সেই সম্পদ হস্তান্তর হয়েছে অথচ ন্যাস রক্ষক রূপে তাকে অভিনয় করতে হচ্ছে। এর চেয়ে মর্মঘাতী কোন বাস্তবকে মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। এই যন্ত্রনা-দায়ক জীবনকে মেনে নিতে হয়েছিল যোগনাথকে।

আসমান একদিন বলল, বিভুকে একদিন নিয়ে এস তাকে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।

যোগনাথ কোন উত্তর না দিয়ে উঠে যাচ্ছিলো। আসমান বাধা দিয়ে বলল, যাচ্ছ কেন ?

বিভুকে আনা সম্ভব নয়। অভিনয়েরও একটা মাত্রা আছে। মাকে পেয়ে মাকে না জানবার মত দুঃখ তাকে দিতে চাই না

আসমান দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, বেশ।

যথারীতি আরোগ্য সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল কোতোয়ালিতে। সেই সাথে জাহির হল যোগনাথের নাম। কোতোয়াল দশটি মোহর উপঢৌকন পাঠাল যোগনাথের কাছে। কিন্তু যার সুনাম ও উপঢৌকনের এত বেশি ব্যবস্থা তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না কোতোয়ালির কোন স্থানে। আসমানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসে যোগনাথ পুঁথিপত্তর বগলদাবা করে এবং সন্তানের হাত ধরে বেরিয়ে পড়ল অনির্দিষ্ট পথে। কাউকে জানিয়ে গেল না তার গন্তব্য স্থল।

পেয়াদা ফিরে এসে জামানখাঁর দরবারে যোগনাথের অন্তর্ধানের সংবাদ পেশ করল। কোতোয়াল ক্ষুন্নভাবে আদেশ জারি করল যোগনাথকে খুঁজে বের করতে পেয়াদা, সেপাই, তুরুক ছুটল যোগনাথের সংবাদ সংগ্রহ করতে। কিন্তু সবাই ফিরে এল নিরাশ হয়ে।

সংবাদ পৌঁছালো হারেমে।

চৌথা বেগম আসমান দরজা বন্ধ করে বোধহয় কেঁদেছিল, না হয় যোগ-নাথের অন্তর্ধানে খুশী মনে টাকাও দান করেছিল।

কিন্তু এই শেষ নয়।

যোগনাথ এবার আশ্রয় গড়ল বালুয়া দিঘীর কিনারায়। নতুন করে ঘর বাঁধল তালপত্র দিয়ে, কাউকে জানতে দিল না কেন সে এসেছে, কি-ইবা তার পরিচয়। সকাল হলেই যোগনাথ বিভূর হাত ধরে নিকটবর্তী গ্রামে ভিক্ষার জন্য বেরিয়ে পড়ত। কোনদিন দ্বিপ্রহরে কোনদিন সন্ধ্যার পরে ফিরে এসে নিজের আস্তানায় ভাত রাঁধতো। এমনি ভাবেই দিন বোধহয় গুজরাণ হত। বিধাতার নির্দেশ অন্যরূপ।

একদল অশ্বব্যবসায়ী এসে বালুয়া দিঘীর পূবপারে আস্তানা নিয়েছিল। সুলতান সরকার থেকে ঘোড়া কিনবার আগে কয়েকদিন পরীক্ষা করা হত ঘোড়ার স্বাস্থ্য। পরীক্ষার জন্য নিযুক্ত হয়েছিল রঘুনাথ।

রঘুনাথ ঘোড়া দেখে ফিরবার সময় অতর্কিতে যোগনাথের সম্মুখে এসে পড়াতে যোগনাথের পরিচয় আর গোপন রইল না। রঘুনাথ জোর করে তাকে নিয়ে গেল দুর্গের ভেতর।

রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করল, বিদ্যায়তন খুলবেন কি ?

না।

চলবে কি করে ?

যোগনাথ উত্তর না দিয়ে নীরবে চলতে লাগল।

সরকারে চাকরি নেবেন ?

কি চাকরি ?

কানুনগোর চাকরি।

পারব কি ?

মানুষ পারে না এমন কাজ আছে কি ? চেষ্টা করলেই পারবেন।

পরদিনই সুলতানী ফরমান এল। যোগনাথ কানুনগোর কর্মে বহাল হল। রঘুনাথ বয়স্ক ব্যক্তি। যোগনাথের মর্মবেদনা উপলব্ধি করেছিল। তাই তাকে কর্ম দিয়ে দুঃখ ভুলতে সাহায্য করতে চাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কানুনগোর চাকুরী ঘরে বসার চাকুরি নয়। বিভূকে কোথাও রেখে না গেলে বাহিরে যাওয়া সম্ভব নয়। রঘুনাথ অবস্থা উপলব্ধি করে বলল, দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করুন।

বিভূর কি ব্যবস্থা হবে ?

আপনি কর্ম সংস্থান করে দিয়েছেন, বিভূর ব্যবস্থাও আপনি করবেন। আপনার পাকশালে বিভূর জন্য একমুষ্টি তণ্ডুল সিদ্ধ অসম্ভব কি?

রঘুনাথ এ বিষয়ে আর আলোচনা করেনি। যোগনাথ কর্মজীবনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কর্মের উন্মাদনায় সে ভুলে গেল ব্যথাতুর বঞ্চনাময় অতীত।

যোগনাথ বলতে বলতে থেমে গেল।

রাধানাথ জিজ্ঞাসা করল, এই শেষ?

শেষ! তা বটে। আদিহীন অন্ত কল্পনা করা যায়না, অন্তহীন আদিও অবাস্তব। যোগনাথের জীবন যখন আরম্ভ হয়েছে তখন তা শেষ হবে, কিন্তু যোগনাথ শেষ হবে, সে রাধানাথের ভূমায় এসে দাঁড়াবে বার বার, নতুন অবয়বে, নতুন ভঙ্গীতে। মানুষের শেষ হয় না কখনও। নাম মরে, মানুষ মরে না, ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়ে সমষ্টি জেগে ওঠে।

তারপর?

তারপর! যোগনাথ দম নিল।

নগরের জীবন বিলাসের জীবন, সম্পদের জীবন, ভোগের জীবন। যোগনাথ নিস্পৃহ নিরাসক্ত। জীবনের রথচক্র গড়াতে গড়াতে চলে। কারও গতি মন্থরগামী, কারও রথ ত্বরান্বিত কিন্তু নিষ্ফল কেউ নয়।

লোক মুখে শোনা গেল সুলতানী বাগিচায় নতুন চিড়িয়া এসেছে। পিঁজরাতে তার স্থান নয়, খোলা রয়েছে পিঁজরার দরজা। চিড়িয়া উড়ে বেড়ায় ডালে ডালে বসে, ঘুম ভাঙ্গায়, গান শোনায়।

এ চিড়িয়া তুর্কী নয়, ফার্সী নয়, দিল্লিওয়ালা নয়, খাস বাংলার চিড়িয়া নরম মাটির মত তুলতুলে তার মাংসপিণ্ড গোলাপী তার গায়ের রং; হাসিতে তার মধু, কথায় তার মোমের নীল শিখা, আলোও আছে তাপও আছে। চিড়িয়ার গুণ যারা শোনে তারা আমির ওমরাহ, আর যারা দানা খাওয়ায় সে হল খাস বাংলার সুলতান।

সংবাদে রঙ চড়ে, দাম চড়ে, শেষে নতুন চিড়িয়া নগরের অর্থবানদের জপমন্ত্র হল। লোটায় সবাই তার পায়ে। চিড়িয়া ঘর বাঁধে না, ঘোরায় চারপাশে, লোট খায়, লোটায় এই হল এর কাজ। ঘেরা টোপের পাল্কী চেপে বেড়িয়ে

বেড়ায় চিড়িয়া, সাথে চলে সুলতানী ফৌজ। চোখে দেখা তো দূরের কথা, সোনার মাপ কম হলে তার পাল্কী দেখাও দায়।

রঘুনাথ গোপনে বলল, এবার মুলুক দুষমন পাবে। সুলতান সুলতানী ছেড়ে লোটাচ্ছে লোটন বাইজীর পায়ে। সর্ব্বনাশের আর দেরী নেই।

সুলতানকে বলুন।

কে বলবে আর জান দেবে।

তাও যদি ঘরের বউ হত। কোথাকার বাইজি। সুলতানের হারেমে স্থান হয়নি, কোতোয়ালী দরজার কাছে তার প্রাসাদ তৈরী হয়েছে। সুলতান শয়ের করতে যায়, শিকার করতে যায়, ঘায়েল হয়ে ফিরে আসে। আমীর ওমরাহদের ঘরে উনুন জ্বলে না, সব কিছু পৌঁছে দেয় লোটনের পায়ে। দেশে অরাজকতা এসে গেল।

হঠাৎ এ বাইজি এসে গেল কোথা থেকে ?

কোতোয়ালী থেকে। কোতোয়াল জামান খাঁ কোতল হয়েছে, তার চৌথী বিবিকে ধরে এনেছে সুলতান। ঘরে ঠাই হয়নি, তাই বাগিচায় ঘর বেঁধে দিয়েছে।

চৌথী বেগম। যোগনাথ চিৎকার করে উঠল।

তুমি অমন করছো কেন ?

না, না। চৌথী বেগমের কথা বলছেন কিনা তাই। একবার, একবার।

কি হয়েছিল ?

চৌথা বেগম নদীতে ডুবে গিয়েছিল, আমি তাকে টেনে তুলেছিলাম নদী থেকে। তাই মনে পড়ল।

যোগনাথের দেহ যেন অসার হয়ে গেল। কোন রকমে দেওয়াল ধরে দাঁড়িয়ে রইল। রঘুনাথ কিছুই বুঝতে না পেরে আবার বলতে লাগল, বাইজির সখ হয়েছে মসজিদ গড়বার। সুলতান আদেশ দিয়েছে তামাম মুলুকে যত কারিগর আছে তাদের হাজির কর। মীনা করা রঙীন ইঁট দিয়ে তৈরী করতে হবে গোটা মসজিদ। রাতের বেলায় চেরাগ জ্বালানো মসজিদ যেন ঝলমল করে ওঠে। এখন আমাদের হয়েছে বিপদ। মাল মসলা, মিস্ত্রী ছুতোর খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হচ্ছে সবাই।

যোগনাথ কোন রকমে নিজের ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল। স্থান

থেকে স্থানান্তরে বেরিয়েও সে নিশ্চিন্ত হতে পারল না। কি যে করবে তা ভেবে না পেয়ে চুপ করে শুয়ে রইল।

বছর ঘুরে গেল।

নতুন মসজিদ তৈরী শেষ হল।

মসজিদের প্রথম আজান দিল সুলতান স্বয়ং। লোটন বাইজি দূরে পাল্কিতে বসে মিঞামোছল্লীর নমাজ পড়া দেখল। নমাজ শেষ করে সুলতান এসে দাঁড়াল পাল্কীর সামনে। জিজ্ঞাসা করল, বাইজি এবার খুশী।

লোটন জবাব দিল, না।

কেন?

খোতবা পড়তে হবে আমার নামে।

বাইজির নামে খোতবা পড়া হয় না কোনকালেই। খোতবা পড়া হয় রাজার নামে, সুলতানের নামে। এ তোমার অন্যায় আবদার।

লোটন কোন কথা না বলে আদেশ দিল পাল্কি ফিরিয়ে নিতে। প্রাসাদের দেউড়ি পেরিয়ে লোটন এসে দাঁড়াল নাচঘরে। নাচের সরঞ্জাম প্রস্তুত করে নিয়ে এল দাসীর দল। লোটন নতুন সাজে সেজে অপেক্ষা করতে লাগল সুলতানের।

সুলতান যখন এল তখন সবে সন্ধ্যা পেরিয়েছে। মদিরাস্নাত সুলতান সোজা এসে দাঁড়াল নাচঘরে। লোটনের মনোমোহিনী মূর্তি দেখে সুলতানের অবস্থা তখন অবর্ণনীয়।

প্রথম কথা বলল লোটন, সুলতান বড় না খোদা বড়?

সুলতান হেসে জড়িত কণ্ঠে বলল, মাটির দুনিয়াতে সুলতান, তার ওপারে খোদা।

যদি সুলতান বড় হয় তাহলে বাইজির ঘরে সুলতান আসত কি?

সুলতানের জ্ঞান চক্ষু খুলে এল। নেশার ঘোরেও বুঝতে পারল, লোটনের নামে খোতবা না পড়বার শোধ আজ লোটন নেবে বাক্যবান দিয়ে! বলল, বাইজি পয়সার মাল, সুলতানের শির নয়, শিরোপাও নয়।

সুলতানের এই পৌরুষ বেশী ক্ষণ স্থায়ী হয়নি। সেই রাতেই ফরমান জারি হল, লোটন মসজিদে লোটনের নামে আগামী কাল থেকে খোতবা পড়তে হবে।

লোটনের চেয়েও সুন্দর এই মসজিদ। সুলতানের আদেশ শোনার পরদিন মসজিদের আশে পাশে কাউকে দেখা গেল না। খোতবা পড়তে ইমাম এল না, নমাজের সারিতে ধর্মভীরু মুসলমান এল না। এল দুজন ভিখারী। লোটন পাল্কীতে চেপে এসেছিল নিজের নামের খোতবা শুনতে কিন্তু কাউকে না দেখে প্রতিহিংসায় সে জ্বলতে লাগল। দুজন ভিখারীর হাতে দুটো মোহর দিয়ে নিজের নামে খোতবা পড়ালো লোটন।

জয়ের দীপ্তি তখন তার মুখে চোখে। লোটন পাল্কী চেপে ফিরে এল প্রাসাদে। আবার সেই বাইজির মোহিনী বেশে সেজে বসে রইল সুলতানের অপেক্ষায়।

রাতের বেলায় সুরার মোহে আদেশ জারি করে সুলতান বুঝতে পারেনি কি ভুল সে করেছে। সকাল বেলায় প্রকৃতিস্থ হয়ে রাতের আদেশ নাকচ করে সুলতান অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে দরবারে বসেছিল। সংবাদ নিয়ে জেনেছিল, লোটনের মসজিদে কেউ নমাজ পড়তে যায় নি। শুধু ছিল দুইজন ভিখারী।

সুলতান আদেশ দিল, দুইজন ভিখারীকে খুঁজে বের করে কোতল করা হোক। আর আদেশ দিল লোটনকে ধরাধাম থেকে সরিয়ে দিতে। শেষের আদেশটি দিল অতি গোপনে। জানতে পেল মাত্র দুইজন খোজা প্রহরী যারা সুলতানের বিশ্বস্ত পার্শ্বচর।

লোটনের প্রত্যাশা নিস্ফল হল। সুলতান আজ রাতে আর এল না। সারঙ্গী তবলচিকে বিদায় দিয়ে লোটন তানপুরা নিয়ে বসল। মাঝ রাতের উক্‌কুস পাখী সময় জ্ঞাপন করল ওয়াক ওয়াক শব্দ করে। লোটন তান-পুরা রেখে অলিন্দে এসে দাঁড়াল। সামনে ভাগিরথী। তর তর করে বয়ে যাচ্ছে দুর্গ প্রাচীর থেকে কিছু দূরে। কোতোয়ালী ঘাটে মালের বজরায় মশাল জ্বলছে, কোতোয়ালী দরজায় মশাল জ্বালিয়ে পাহারা দিচ্ছে শান্ত্রীরা। মাঝে মাঝে হাঁক ছাড়ছে পাহারাদাররা। জোড়া তুরুক দুর্গ প্রাচীর দিয়ে কিছুক্ষণ পর পর মশাল হাতে ছুটে যাচ্ছে। দুর্গের মানুষ সবাই তখন নিদ্রিত একমাত্র জেগে রয়েছে তীরন্দাজ আর পাহারাদারের দল। দূর থেকে কখনও কখনও ভেসে আসছে শেয়ালের ডাক। নিস্তব্ধতার মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোটন বাইজি, কোতোয়ালের চৌথী বেগম, নারায়নদাসের আসমান আর

যোগনাথের অমৃতময়ী। আকাশের তারা জল্ জল্ করছে। প্রাসাদের দেউড়িতে নিজস্ব পাহারা বন্দোবস্ত রয়েছে লোটনের। তারাও বোধ হয় ঝিমুচ্ছে। নগর কোতোয়াল রাতের চৌকি শেষ করে ফিরে গেছে, নগর চৌকিদারও হাঁক দিয়ে ফিরে গেছে।

লোটন বাইজি অলিন্দ ছেড়ে শোবার ঘরে পা বাড়িয়েছে, সামনে এসে দাঁড়াল যমদুতের মত দুজন হাবসী খোজা, খোলা তলোয়ার তাদের হাতে। লোটন চিৎকার করে উঠল, কে কে কি চাই!

দেউড়ির পাহারাদারের ঝিমুনি ছুটে গেল লোটনের চিৎকারে। তারা ছুটে আসবার আগেই লোটনের দ্বিখণ্ডিত দেহ লুটিয়ে পড়ল গালিচার ওপর। প্রাচীর ডিঙিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল জহ্লাদ দুজন।

সুলতান ইসুফশাহের কাছে সংবাদ পৌঁছাল সেই রাতেই। সুলতান নির্বিকার ভাবে আদেশ দিল, দুর্গের বাহিরে আম বাগিচায় লাশ পুঁতে দাও।

সকাল বেলায় নগরের সব মানুষ জানতে পারল গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ দিয়েছে লোটন বাইজি। সংবাদ পৌঁছালো যোগনাথের কাছেও। সংবাদ শুনে যোগনাথ পাথরের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বিভুনাথ এসে আঁকড়ে ধরল তাকে। আজই প্রথম যোগনাথের গাল বেয়ে চোখের জল নামল অজস্র ধারায়। যোগনাথ কেন কাঁদল কেউ জানল না। লোটনের অতৃপ্ত আত্মা বোধহয় কয়েক ফোঁটা চোখের জলের প্রতীক্ষা করছিল।

দিন পেরিয়ে রাত এল।

শেষ রাতে চুপি চুপি বিভুনাথের হাত ধরে যোগনাথ বের হল বাসস্থান থেকে। কোতোয়ালী দরওয়াজায় এসে এত্তালা দিল। নগর কানুনগো বাইরে যাবে। দুর্গের ভাম দরওয়াজা খোলা হল সুলতানী পাঞ্জা দেখে।

যোগনাথ এগিয়ে চলল আম বাগানের দিকে।

অন্ধকারে হাতরে হাতরে লোটনের কবর খুঁজে বের করল। নতুন কাপড় জড়ানো রক্তাক্ত দেহটা কাঁধে করে নিয়ে গেল ভাগিরথীর তীরে।

উষার প্রথম আলোতে চিতা সাজিয়ে লোটনের দেহ তুলে দিল চিতায়। বিভুনাথের হাতে আগুন দিয়ে বলল, এর মুখে ছুঁইয়ে দাও।

বিভুনাথ আগুন ছুঁইয়ে জিজ্ঞাসা করল, এ-কে বাবা?

যোগনাথ তখন চিতায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। পুত্রের মৃত্যুকণ্ঠস্বর তার কানে পৌঁছাতেই হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে উঠবার মতো করে বলল, তোমার মা।

শিশু বিভূনাথ চমকে উঠল কিন্তু মা সম্বন্ধে তার জ্ঞান ছিল না মোটেই, তাই দ্বিতীয় প্রশ্ন না করে জলন্ত চিতার দিকে চেয়ে রইল।

শোন রাধানাথ, তুমি অমৃতময়ীর বংশধর।

রাধানাথ আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল।

অমৃতময়ীর পরিণাম স্বাভাবিক জীবনের দৃষ্টান্ত মাত্র। যোগনাথ অমৃতময়ীকে জানতে চায়নি, অমৃতময়ীও কখন যোগনাথকে বিচার করেনি। এই হোল জানা-অজানার বিষময় পরিণতি।

যোগনাথ ডাকল, রাধানাথ।

বলুন।

আমি যাচ্ছি, এ ভুল তুমি যেন করনা।

ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল যোগনাথ ন্যায়রত্ন। পাঁচশত বছর আগের এই করুণ কাহিনী শুনতে শুনতে রাধানাথ ঘুমিয়ে গেছে।

বাহিরে তখন লোক চলাচল শুরু হয়েছে। দিনের আলোতে নিকটস্থ বনানী আলোকিত হয়েছে। বন মুরগীর ক্ক-ক্ক ধ্বনি মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে।

রাধানাথের ঘুম ভেঙ্গে গেল।

চোখ ডলতে ডলতে উঠে বসে রাধানাথ ভাবতে লাগল স্বপ্ন না সত্য অথবা দুই-ই। অমৃতময়ীর বংশধরই কি সে নিজে? অমৃতময়ীর সন্তান কি সে নিজে? কুলুঙ্গী থেকে কুলপঞ্জিকা বের করে রাধানাথ উল্টেপাল্টে দেখতে থাকে।

হাঁ তাইতো। যোগনাথের অষ্টাদশ পুরুষ রাধানাথ। অমৃতময়ীর সন্ধান কোথাও খুঁজে পেল না। কুল পঞ্জিকার জীর্ণ তালপত্রে অমৃতময়ীর নামের দৈন্য কেউ কালির আঁচড়ে লিখে রেখে যায়নি। কালিমা কেউ প্রকাশ করতে চায়নি। তাই সত্য বলে মেনে নিতেও পারছিল না আজকের এই স্বপ্নকে।

॥ ৩ ॥

স্নান করে যখন শ্যামের মন্দিরে এল রাধানাথ তখন অনেক বেলা হয়েছে। রাতের স্বপ্ন এমন ভাবে মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে রাধানাথ যন্ত্রের মত দৈনন্দিন কাজগুলো করতে বাধ্য হয়েছিল। মনের ঘড়িতে এমন ভাবে যোগনাথ দম দিয়ে দিয়েছিল যাতে তার মনোজগতে ছকবাঁধা কাজগুলোর কোন বস্তুর অবস্থান যেন ছিল না। ঘড়ির কাঁটার মত আপনা থেকে দাগ পেরিয়ে পরবর্তী দাগের দিকে অগ্রসর হতে থাকে কর্ম তালিকার নিত্য কর্মগুলো। মোহাবিষ্টের মত নীরবে নিজের কাজ শেষ করতে পারলেই সে যেন বাঁচে।

বিশাখা উন্মুখ হয়ে বসেছিল রাধানাথের আগমন প্রত্যাশায়। রাধানাথ সোজা হাত পা ধুয়ে বিগ্রহের সামনে এসে বসল। কোশা থেকে জল নিয়ে আচমন করে পূজায় বসল। বিশাখা নীরবে লক্ষ্য করতে থাকে রাধানাথের কাজ। রাধানাথ পূজা শেষ করে উঠে দাঁড়াতেই বিশাখা বহুক্ষণের মৌনতা ভঙ্গ করে বলল, আপনার শরীর বুঝি ভাল নেই ?

রাধানাথ সংক্ষেপে উত্তর দিল, হাঁ।

কালকের ঐ ঝড় বৃষ্টিতে না ভিজলেই পারতেন। শরীর ভাল না থাকলে কয়েকদিন বিশ্রাম নিন।

তাই ভাবছি। সে উপায় তো দেখছিনা। সামনে জন্মাষ্টমী। মেলার সময়। বহু অতিথি অভ্যাগত আসবে। বিশেষ উপাচারের বন্দোবস্ত করতে হবে। এদিকে আদায় পত্তরও বিশেষ নেই। ভেবেও ঠিক করতে পারছিনা বিশ্রাম আমার ভাগ্যলিপি কি না!

বিশাখা মৃদুস্বরে বলল, জন্মাষ্টমীর এখনও দু মাস দেরী। এখন ব্যস্ত হবার মতো কিছু নেই।

কি বলছ ? গেল বছর ধান ছিল, আম ছিল, হাজার হাজার লোকের জন্য

প্রসাদের ব্যবস্থা হয়েছিল। এবার ধান এবং আম দুটোই নেই। ঠাকুরের নিত্য সেবার পর পালপার্বনের টাকা সংগ্রহ খুবই কঠিন হবে।

কাল থেকে একটা কথা ভাবছি। আপনার মতামতটা জানবার অপেক্ষায় রয়েছি। এখন শুনবার সময় হবে কি?

সময়ের অভাব হলেও সময় করতে হবে। তোমার কথাই বল।

ঘর সংসার ঠাকুর দেবতা সব কিছুর দায়িত্ব রইল আপনার।

আর তুমি?

আমি কলেজে পড়তে চাই। হয় রাজসাহী না হয় কলকাতায় বাসা ভাড়া নিয়ে আরও কয়েক বছর পাঠ্যজীবন যাপন করতে পারলে বোধহয় নিজেকে সোজা করে দাঁড় করতে পারব।

রাধানাথ অবাক হয়ে বিশাখার মুখের দিকে চেয়ে থেকে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। অন্যমনস্ক ভাবে বলল, বাড়ি ঘর ঠাকুর দেবতা, এতো দায় নেবার ক্ষমতা আমার আছে কি?

আপনি নিমিত্ত মাত্র। পিসিমা বাড়িঘর দেখবেন, ঠাকুর সেবার ব্যবস্থা করবেন। সরকার মশায় আদায় তশীল করবেন। আপনি শুধু বুঝে নেবেন, কি হচ্ছে আর কি হচ্ছে না।

রাধানাথ কথান্তরে যাবার শেষ চেষ্টা করে বলল, ওবেলায় ভেবে বলব।

বিকেল বেলায় রাধানাথ আসতেই বিশাখা জিজ্ঞাসা করল, চিন্তা শেষ হয়েছে।

মোহাবিষ্টের মতো রাধানাথ বলল, শেষ হয় নি। চিন্তার শেষ হয় কখনও। কালকে বলব।

কাল নয়, আজ। আমিও সারাদিন ভেবেছি। মাটি-পাথরের দেবতা নিয়ে জন্মান্তরের সাধ মেটে, এ জন্মের সমস্যা মেটে না। তাই প্রয়োজন হয়েছে নিজেকে গড়ে তোলবার।

বিশাখার বক্তব্যে কেমন যেন অশ্রদ্ধার ভাব। রাধানাথ সেইটুকু লক্ষ্য করে বলল, কি বলছ অন্নদা?

ঠিক বলছি মাষ্টার মশায়।

ঠিক নয়। গড়ে তোলবার পথ সম্বন্ধে আমি দ্বিমত নই কিন্তু দেবতার মাটি-পাথরের রূপ সব নয়। প্রাণের স্পন্দন দিয়ে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে

হয়। তুমি হয়ত তা পারছ না, তা বলে তাকে অশ্রদ্ধা করবার কোন কারণ থাকতে পারে না।

বিশাখা পায়ের আঙুল দিয়ে মাটি খুঁটতে খুঁটতে বলল, অশ্রদ্ধা যাকে বলছেন তা ঠিক অশ্রদ্ধা নয়। আশাহীনতার অভিব্যক্তি মাত্র। বয়স্ক অকর্মন্য সন্তানকে পিতামাতা কর্মমুখী করতে চায়। স্থবির সন্তানকে ভালবাসে। তার বেশি আশা করা বাতুলতা নয় কি ?

তুমি কি দেবতার বিগ্রহকে স্থবির অকর্মন্য মনে কর ?

বিশাখা নীরবে নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইল।

গম্ভীরভাবে রাধানাথ বলল, এ অনাচার সহ্য হবে কি ?

এ প্রশ্ন নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন মাস্টার মশায়। আপনি-ই খুঁজে পাবেন এর সদুত্তর। আমার বক্তব্য খুবই সহজ এবং সরল। আপনি রইলেন আর রইল শ্যামসুন্দর, আর রইল আমার পিতৃদত্ত বিত্ত। যা করবার আপনি করবেন। আমি কিছুই করতে পারব না। যে দেবতা অনাচার রোধ করতে পারে না, সে দেবতা আমার জন্য নয়।

রাধানাথ তীব্র প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। বিশাখার চোখের দিকে চেয়ে মনে হল আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত আসন্ন। বিশাখা আবেগের সাথে বলতে থাকে, জ্ঞান হওয়া অবধি শ্যামের সেবা করে এসেছি। সেবিকা পেয়েছে শুধু আত্মবঞ্চনা। বাবা বলতেন শ্যাম হল শিব, শিব হল মঙ্গল। সে মঙ্গল কার মঙ্গল ?

মৃদুস্বরে রাধানাথ বলল, সে মঙ্গল ব্যক্তির নয়, বিশ্বের।

কুমারসম্ভব পড়াতে গিয়ে আপনি বলেছিলেন, শিব নারী জীবনের কাম্য। সে কামনা কি বাস্তব না অবাস্তব কল্পনা !

গৌরীর তপস্যা সৃষ্টিকে রক্ষা করতে। সেখানেও বিশ্বের মঙ্গল নিহিত। তাই নারী নিমিত্ত মাত্র, বিশ্বের মঙ্গলই এর তাৎপর্য।

ব্যক্তি বাদ দিয়ে বিশ্ব। কি বলছেন আপনি। বারিবিন্দু বাদ দিয়ে সমুদ্র কল্পনা।

রাধানাথ অধৈর্য হয়ে চিৎকার করে উঠল, কি বলছ বিশাখা।

বলছি, নিজেকে বঞ্চনা করে বিশ্বের মঙ্গল অবাস্তব।

রাধানাথ কোন রকমে আত্মসম্বরণ করে বলল, তোমার মতিভ্রম ঘটেছে। কাল ভেবে চিন্তে জবাব দিও।

বিশাখা হাসল।

রাধানাথ বিশাখার হাসি উপেক্ষা করে অগ্রসর হতেই বিশাখা ডাকল, শুনুন।

রাধানাথ ফিরে দাঁড়াল।

জ্ঞানলাভের জন্য আপনার পাঠশালে পাঠ নিয়েছি। গৃহশালে পাঠ নিয়েছি জীবনের। গৃহশালার পাঠ বাস্তব এবং মর্মান্তিক। অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ হয় আক্ষরিক অভিধানে। মানব জীবনে তা হ্রস্ব হয়, তার প্রকৃষ্ট প্রমান আমি নিজে। বলেই ত্বরিত পদে বিশাখা উঠোন পেরিয়ে গৃহের দিকে চলে গেল।

রাধানাথ বিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বোধহয় বিশাখাকে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করছিল। অবশেষে বিরক্তির সাথে বলে উঠল, যাকৃগে।

কিন্তু যে প্রস্তাব বিশাখা উত্থাপন করেছিল সে প্রস্তাবের মীমাংসা করতে পারল না রাধানাথ। গৃহে ফিরে এসে গীতা খুলে বসল। মনকে সেই একের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে প্রশান্তির রুগ্ন চেষ্টা করতে লাগল।

বিশাখা গৃহে প্রবেশ করেই সরকারকে ডেকে পাঠাল। সরকার আসতেই জিজ্ঞাসা করল, বাবার সম্পত্তির শালিয়ানা আয় কত?

বৃদ্ধ সরকার বিশাখার কাছ থেকে এরকম প্রশ্ন কখনও আশা করেনি। কড়াগণ্ডা মিলিয়ে হিসাব দেওয়াও সম্ভব নয়। বিশাখার প্রশ্ন এত তীক্ষ্ণ যে উত্তর না দিলে অঘটন ঘটাও অসম্ভব নয়।

আমতা আমতা করে সরকার বলল, আমের ফলন হলে তিরিশ পঁয়ত্রিশ শত টাকাও আয় হয়। আর যেবার আমের ফলন থাকে না সেবার পঁচিশ ছাব্বিশ শতও হয়।

বিশাখা আবার জিজ্ঞাসা করল, শ্যামের সেবার শালিয়ানা কত ব্যয় হয়।

পাঁচ থেকে ছয় শত টাকা।

বিশাখা কি যেন ভাবল। সরকার মশায় পরবর্তী প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছিল। বিশাখা মোলায়েম ভাবে বলল, আজ রাতে একখানা নৌকা চাই। লালগোলায় কাল সন্ধ্যার গাড়ি ধরতে হবে। আপনিও প্রস্তুত হয়ে থাকবেন আমার সাথে যাবার জন্য। আর যা করবার তা মাস্টার মশাইকে লিখে দিয়ে যাব।

সামনে জন্মাষ্টমী। এখন কোথাও না গেলে হয় না!

হয় না। যদি হত তা হলে বলতাম না। যান, সব কিছু প্রস্তুত করে নিন।

সরকার মশায় কিছুই বুঝতে না পেরে প্রভুকন্যার আদেশ তামিল করতে বেরিয়ে গেল। বিশাখা কাগজ কলম নিয়ে বসল রাধানাথকে চিঠি লিখতে।

লিখল : মাষ্টার মশায়, আমি যাচ্ছি। সব কিছু রইল আপনার হেপাজতে। মাসে মাসে পঞ্চাশটি টাকা আমায় পাঠাবেন। যদি কখনও ফিরে আসি সেদিন জানাব কেন আমার এই যাত্রা। সঙ্গে সরকার মশায় যাচ্ছেন।

নৌকা এসে ভিড়ল শ্যামের ঘাটে। লটবহর ওঠানো হল তাতে। দাসীর হাতে চিঠি দিয়ে বিশাখা সরকার মশায়ের সাথে এসে উঠল নৌকায়। মাঝিরা লগি ঠেলে ঘাট ছাড়তেই বিশাখা হঠাৎ হাতজোড় করে মৃদুকণ্ঠে বলল, ঠাকুর, তোমার বিরুদ্ধেই আমার অভিযোগ। যদি সত্যকার কোন ধর্ম থাকে, সে ধর্ম রক্ষার দায়িত্ব রইল তোমার। রক্ত মাংসে গড়া মানুষের ওপর সে দায়িত্ব ছেড়ে দিও না।

ভাটির টান আর জোর হাওয়ার বাদাম নৌকাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলতে থাকে। ছইয়ের সামনে বসে বিশাখা অনিমেষ নয়নে আকাশের দিকে চেয়ে রইল। আকাশের বুকেই বুঝি বা তার সারা জীবনের পুঞ্জীভূত প্রশ্নের উত্তর লেখা রয়েছে। আকাশের ঘন নীলাঙ্কে মিটি মিটি তারকা রাশি যেন তার এই বেপরোয়া যাত্রার সাক্ষ্য হয়ে রইল। মিষ্টি বাতাসে আর মনের দ্বন্দ্বে ক্লান্তি বোধ করতে লাগল, হাত পা গুটিয়ে শুয়ে পড়ল ছই-এর সামনে।

বর্ষার নদী খল্ খল্ করে হাসছে। ডিঙ্গি ছুটে চলছে। দূরে বনের কোলে গৃহস্থ বাড়ির বাতি মিট্‌মিট্ করে যেন চেয়ে আছে। নৌকা এগিয়ে চলে ভাটিতে।

কে যেন ডাকল, বিশাখা।

বিশাখা সজাগ হয়ে কান পেতে রইল।

না কেউ ডাকেনি। স্বপ্ন। না, মায়া। না, স্বপ্ন এবং মায়ার সংমিশ্রণ।

সাতাশ ঘরার হামামে কে নাইতে যায়?

আসমানতারা ?

আসমানতারা কে ?

রাজার প্রণয়িনী।

ওকি ? মহানন্দার তীরে এত সোরগোল কেন ? কার মৃতদেহ ? না, মৃতদেহ নয়তো।. কুশপুত্তলিকা ! কুশপুত্তলিকা দাহ করছে মহারাণী। পুত্র যদুর কুশপুত্তলিকা !

রাজা গণেশের কুলভ্রষ্ট ধর্মত্যাগী পুত্র। নারীর প্রণয়কে পিতৃধর্ম থেকে বড় মনে করে জলাঞ্জলি দিয়েছে সর্বস্ব। মহারাণী অন্দর থেকে ছুটে বেরিয়েছেন পথে। ধর্মত্যাগী পুত্রের মুখদর্শনও পাপ। পুত্রবধু চন্দ্রকুমারীর হাত ধরে মহারাণী এসোছন শ্মশানে।

মশাল শোভাযাত্রা বের হয়েছে রাজপ্রসাদ থেকে। একলাখী মসজিদে আজ বিবাহের কলমা পড়া হবে। নতুন সুলতান জালালুদ্দিনের সাথে পুরাতন সুলতানের কন্যা আসমানতারার বিয়ে।

দীপমালায় সাজানো হয়েছে নগর, সাজানো হয়েছে পাণ্ডুয়ার দুর্গ। তুরীর আওয়াজে ছুটে এসেছে নারী-পুরুষ। সারিবদ্ধ ভাবে তারা দাঁড়িয়েছে পথের দুধারে। কাড়ানাকাড়া দামামার সাথে নহবত বাজছে প্রাসাদ আঙ্গিনায়। সুলতান যাচ্ছেন হাতীতে চেপে বিয়ে করতে।

সুলতান জালালুদ্দিন। রাজা গণেশের একমাত্র বংশধর। সুলতান ভুলে গেছে সামান্য ভুঁইয়া থেকে গৌড় রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছিল তার পিতা। যে বৈভব আজ তার মুষ্টিগত, সে বৈভব সৃষ্টি হয়েছিল রাজা গণেশের সারা জীবনের অক্লান্ত শ্রমে, উচ্চাশার আসক্তিতে।

সুলতানী হাতী এসে দাঁড়াল লাখ মুদ্রায় নির্মিত একলাখী মসজিদে।

মহানন্দার কিনারায় সেই মুহূর্তে জ্বলে উঠল তার চিতা। জীবন্ত মানুষকে আয়ত্বে না পেয়ে মানুষের কুশমূর্তি তুলে দেওয়া হল চিতায়। রাণী চন্দ্রকুমারী বাম হাতে মুখ ঢেকে কুশ পুত্তলিকায় আগুন ছুঁইয়ে হাতের শাঁখা খাড়ু জলে ভাসিয়ে কপালের সিঁদুর মুছে উঠে বসল অপেক্ষমান ডিঙ্গিতে।

ডিঙ্গি ভেসে চলল মহারাণী আর তার পুত্রবধূকে নিয়ে।

আকাশের তারকাপুঞ্জ মিটি মিটি করে চেয়ে আছে সাক্ষ্যরূপে।

কে কেঁদে উঠল !

বিশাখা ধরমর করে উঠে বসল। শ্মশানের বটগাছে মাথায় ক্ষুধার্ত শকুনির বাচ্চা কোঁকিয়ে উঠেছে, তারই আর্তনাদ।

চন্দ্রকুমারীর বুক ভাঙ্গা ক্রন্দন নয়। নারীর ক্রন্দন দিয়ে ইমারত তৈরী হয়েছে সুলতানী হারেমে। সে ক্রন্দন মানুষ শুনতে পায় না। যারা কাঁদে তারা কাঁদতে জানেনা, ক্রন্দন শোনাবার মত কণ্ঠের তেজ তাদের নেই।

ভাবতে ভাবতে বিশাখা ঝিমিয়ে পড়ল।

ইতিহাসের পাতার পর পাতা বাতাসে উল্টে যেতে থাকে তার মনের মুকুরে। ইতিহাসের কালির আঁচড় স্পষ্ট হয়ে ওঠে না, কেমন ঝাপসা মনে হয় ওসব কাহিনী।

জালালুদ্দিনের প্রেম ব্যর্থ হয়নি, আসমানতারার প্রণয় ব্যর্থ হয়নি। মৃত্যুর পর আসমানতারাকে পাশে নিয়েই শুয়ে রয়েছে জালালুদ্দিন, পাশেই স্থান করে নিয়েছে আসমানের দুলাল, জালালের চোখের মণি সামসুদ্দিন।

কল্পনা নয়। বাস্তব আজ কল্পনার লতাপাতা বেয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সেদিন যা ছিল সত্য, আজ তা দিব্য দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হয়, মনে হয় অসার কল্পনা।

হয়ত তাই।

বিশাখা আবার হাত পা গুটিয়ে শুয়ে পড়ে পাটাতনের ওপর। মিঠে বাতসে চোখের পাতা জড়িয়ে আসে।

মাঝিরা কল্কেতে তামাক ভর্তি করে আগুন দিল। হাত বদল হতে থাকে কল্কে সমেত খেলো হুঁকো। গুর্ গুর্ শব্দ বের হয় হুঁকোর বুক ভেদ করে। বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয় সে শব্দ। তন্দ্রার মাঝে সেই শব্দ শুনতে পায় বিশাখা। কে যেন কানে কানে বলে দেয়, আকাশে মেঘ, কালোর কালিমা দিগন্তে। ঐ বোধহয় অন্ত।

দূরের পানসি থেকে কে চিৎকার করে উঠল, কে যায় ?

মাঝিরা সরকার মশায়কে ডেকে তোলে।

সরকার মশায় গতিক ভাল নয়। পানসি এগিয়ে আসছে এদিকে।

সরকার যুবকের শক্তি ফিরে পেল বিপদের আশঙ্কায়। জিজ্ঞাসা করল,

তোরা তিনজন আর আমি। বিশজনের মহরা নেব, কিনারায় টান দে, বাদাম নামা।

শোঁ করে নৌকার মুখ ঘুরে গেল। হুড়্ হুড়্ করে বাদাম নামালো মাঝিরা। সরকার প্রস্তুত হয়ে নিল বিপদের আশঙ্কা করে।

বিশাখার তন্দ্রা ছুটে গেল মাঝিদের ফিস ফিসানিতে। জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে? আমরা কতদুর এসেছি।

সরকার বলল, ঐ পানসিটাকে ভাল মনে হচ্ছে না। আমরা ঋষিপুর পেরিয়ে এসেছি।

বিশাখা উঠে দাঁড়িয়ে কোমরে কাপড় জড়িয়ে নিল। বলল, একটা বৈঠা দাওতো মাঝি?

বৈঠা দিয়ে কি হবে মাঠান। আমরা চারজনেই মহরা নিতে পারব।

পাঁচজন হলে তোমাদের মান যাবে না। দাও বৈঠা।

সরকারে মহাশয়ের দৃষ্টি ছিল পানসির ওপর। বলল, ওরা পানসির মুখ ঘুরিয়েছে।

মাঝিরাও লক্ষ্য করল পানসি অপর পারে ভিড়ছে। হালের মাঝি ভীত-ভাবে বলল, আজ রাত ঋষিপুরের ঘাটেই কাটাই।

বিশাখা হেসে বলল, ভয়ে বুঝি।

না মাঠান্, এরা ভাল লোক নয়। একটা কাটিয়ে নিয়ে আরেকটার হাতে পড়তে কতক্ষণ। বরং সকাল বেলায় নৌকা ছাড়লে জলপান খাবার বেলায় গোদাগাড়ি পৌঁছবো, নাহলেও বড় গাঙ্গে পৌঁছাব।

বিশাখা বলল, বেশ বাতাস আছে। বাদাম তুলে দাও। সকাল না হতেই আমরা নিশ্চয়ই বড় গাঙ্গে পৌঁছাব। পথ চলতে ভয় করলে পথ চলা উচিত নয়।

সরকার মাঝিদের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়েও রাজি করতে পারল না। মেয়েবুদ্ধি সর্বনাশা বুদ্ধি তা বুঝতে কারুরই দেরি হল না। প্রত্যেকেই মনে মনে বিশাখার চৌদ্দপুরুষের পিণ্ডদান করছিল, কিন্তু যার চৌদ্দপুরুষের পারলৌকিক ক্রিয়া ওরা করছিল, তার দিক থেকে মত বদলানোর কোন লক্ষণ দেখা গেল না। বাধ্য হয়েই ডিঙ্গির মুখ ঘুরিয়ে বাদাম তুলে দিল মাঝিরা।

পদ্মায় আসতে আসতেই দেখা দিল ভোরের আলো। ডিঙ্গি খর-

স্রোতে নর্তন সুরু করে দিল। সরকার চিন্তিতভাবে বলল, ডাকাতের হাত থেকে বেঁচে শেষে কি পদ্মার ডুবে মরতে হবে।

বিশাখাও উৎকণ্ঠিত ভাবে বলল, নৌকা কিনারায় ভেড়াও। উছলে উছলে নৌকায় জল উঠছে।

মাঝিরা এবার শক্তিমান। তারা হেসে বলল, ডিঙ্গি কখনও ডোবে না মাঠান্। যদি ডোবে তার জন্য দায়ী হয় সোয়ারী। যেখানে বসে আছেন সেখানেই থাকুন। নড়চড় করলেই বিপদ হবে। পাশ হিল্‌লে উল্টে যাবে।

মাঝিরা যতই সান্ত্বনা দিক সরকার মশায় মোটেই আশ্বস্ত হতে পারল না। ডিঙ্গি তীর বেগে ছুটে চলল ভাটিতে। হালের মাঝি যেন কাঠের পুতুল। হাল ধরে নিশ্চল ভাবে বসে রয়েছে সে। বাদামের দড়ি হাতে নিয়ে আরেক-জন তাকিয়ে রয়েছে দূরে সেই সীমাহীনা জলস্রোতের দিকে। তৃতীয় মাঝি মাটির মালসায় ঘুঁটে দিয়ে আগুন উস্কে দিচ্ছে মাঝে মাঝে। তাদের কারুর চেহারায় কোন আতঙ্কের চিহ্ন নেই। যেন তারা নিজেদের বৈঠকখানায় বসে আড্ডা গুলজার করতে করতে সাময়িক বিশ্রাম নিচ্ছে।

বিশাখা জিজ্ঞাসা করল, আর কতদূর ?

ঐ যে ধুঁয়া দেখছেন ঐ হোল গোদাগাড়ি। ক্রোশ তিনেক হবে। এক ঘণ্টায় পৌঁছে যাব।

আর লালগোলা ? জিজ্ঞাসা করল সরকার মশায়।

বিশাখা বলল, লালগোলায় আর দরকার নেই। গোদাগাড়ি থেকে ষ্টীমারে নদী পার হব। আড়াআড়ি নদী পার হয়ে আর কাজ নেই।

বিশাখা ছই-এর তলার সরে গিয়ে হাত পা মেলে শুয়ে পড়ল।

গোদাগাড়ি ঘাটের যথেষ্ট দূরত্ব রেখে মাঝিরা নৌকা বেঁধে তোলা উনুনে আগুন দিল। বিশাখা উজানে নিরিবিলি জায়গা দেখে স্নান করে কাপড় বদলে নিল। সরকার মশায়কে তাগাদা দিতে লাগল হাত মুখ ধুয়ে আসতে।

সরকার মশায় হাত মুখ ধুয়ে প্রস্তুত হতেই বিশাখা একথালা খাবার এনে দিল তাকে। প্রচুর খাদ্যের ব্যবস্থা অবশ্যই খুশী করেছিল সরকারমশায়কে, লৌকিকতার খাতিরে জিজ্ঞাসা করল তোমার খাবার ?

আছে।

তুমি নিয়ে বস। গঙ্গাবক্ষে জাতি পাত হবার আশঙ্কা নেই।

বিশাখা হাসল। কোন কথা না বলে কলাপাতায় খাবার ঢেলে নিল।

খেতে খেতে সরকারমশায় বলল, আজ রাত্তিরের গাড়িতে গেলেই ভাল হয় ?

কেন ?

যেখানেই যেতে চাও দিনের বেলায় পৌঁছাতে পারলেই ভাল। বিশেষ করে নতুন জায়গায় রাতে যেতে নেই।

যুক্তিটি বিশাখার মনঃপুত হল। বলল, তা হলে রাতের ষ্টীমারে নদী পার হয়ে শেষ রাতের গাড়িতে রওনা হব।

কোথায় যাবে তাতো এখনও ঠিক করনি।

ঠিক করেই বেরিয়েছি সরকার মশাই। যাব কোলকাতা।

পরদিন সকাল বেলায় গাড়ি এসে পৌঁছাল কলকাতায়।

স্বপ্নের কোলকাতা যখন বাস্তবে এসে দাঁড়াল সম্মুখে তখন আবেগময় আনন্দের সাথে কেমন হতাশার ভাব দেখা দিল বিশাখার চোখে মুখে। এত বড় ষ্টেশন, এত লোকজন, এত হৈ-হৈ, এত গাড়ি ঘোড়ার সমাবেশ বিশাখা কল্পনাও করেনি। মানুষের এই বিরাট মিছিলে নিজের স্থান গড়ে নিতে পারবে কিনা তা ভেবেই পাচ্ছিল না বিশাখা।

সরকার মশায় বুঝতে পারল, বিশাখার কেবলমাত্র দৈহিক ক্লান্তি নেমে আসেনি, সেই সাথে এসেছে মানসিক অবসাদ। মৃদুকণ্ঠে বলল, আর এগিয়ে কাজ নেই, চলো আমরা ফিরে যাই।

বিশাখা যেন সম্বিত ফিরে পেল, দৃঢ়কণ্ঠে বলল. তা হয় না।

কিন্তু !

কিন্তু নেই সরকার মশাই। চলুন কোন হোটেলে, তারপর বাসা ভাড়া নিন। আমাকে পড়তে হবেই। তার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে আপনি ফিরে যাবেন।

অভিভাবক বিহীন অবস্থায় একা থাকতে পারবে কি ?

কেন পারব না। নিশ্চয় পারব। বাবা মৃত্যুর সময় তার অভিভাবকত্বের দায় আমার মাথায় তুলে দিয়ে গেছেন।

হোটেলে এসে সরকার মশায় সাময়িক আশ্রয় গড়ে নিল। তখন বাসা খুঁজে বের করা হল সমস্যা। যে ব্যক্তি ইহ জীবনে কখনও কোলকাতা শহরে আসেনি তার পক্ষে রাস্তা ঘাট ঠিক করে বাসস্থান খুঁজে বের করা দুঃসাধ্য। সরকার মশায় আরও বেশি অসহায় বোধ করতে লাগল।

সরকার মশায় কয়েকদিন ঘুরে ফিরে যখন নিরুপায়ের মতো হাত পা ছড়িয়ে দিল তখন বিশাখা হোটেলের মালিকের শরণাপন্ন হল। শরণাপন্নকে উদ্ধার করল হোটেলের মালিক। পটলডাঙ্গার গলিতে ছোট একটি বাসা ভাড়া করা হল। সেইদিনই বিশাখা উঠে এল বাসায়।

সারাদিন ঘরকন্না গুছিয়ে বিশাখা ক্লান্ত হয়ে মাদুরে গা এলিয়ে দিয়েছিল, সরকার মশায় গিয়েছিল বাজার থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে। বিশাখার চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে বিগত উনিশটা বছরের কথা। ছোট বেলায় রাধানাথের পাঠশালা থেকে পিতার হাত ধরে বেরিয়ে এসেছিল! বাবা বলেছিল, আর তোমাকে পড়তে হবে না। পিসিমা জানিয়ে দিয়েছিল, তোর বিয়ে। বিবাহ যে কি বিশাখা জানত না। আরও ছোট-বেলায় সান্যালদের বাড়িতে গিয়েছিল বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে। সেখানে সেজে-গুজে মেয়ে পুরুষে ভীড় করেছিল। শাঁখ বেজেছিল, ঢোল সানাই বেজেছিল, লোকে কলাপাতা পেতে সারি দিয়ে খেতে বসেছিল। বিয়ের কথা শুনে বিশাখারও মনে হয়েছিল এমনি ধারা আনন্দ উৎসব হবে তারও বাড়িতে। নিদ্রাজড়িত চক্ষে মাঝ রাতে সে উঠে এসে দাঁড়িয়েছিল বিয়ের আসরে। হলুদ ছোপানো ধুতি পরে ইয়া লম্বা চওড়া একটি লোক এসে দাঁড়াল তার পাশে। তারপরে কি হল মনে নেই।

পিসি তারাময়ী হলুদ ছোপানো শাড়িখানা দিয়ে মুখ ঢেকে দিয়ে বলেছিল, ঐ তোর বর, পছন্দ হয়।

এমন্ অদ্ভুত দর্শন ষণ্ডামার্কা ব্যক্তিটিকে বিশাখার মোটেই পছন্দ হয়নি। সে বলল, দুর্! ও আমার বর হবে কেন, ওতো সিং বাড়ির দারোয়ান। দারোয়ান কখনও বর হয় নাকি!

মিশির বুঝতে পারেনি তার কথা। দারোয়ান কথাটা তার কানে যেতেই মিশির তার কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিত গুম্ফে হাত বুলিয়ে বলল, বাতাইছো ঠিক্, দারোয়ান বাটে।

বিবাহের যে সরল সুন্দর চিত্র তার শিশুমনে ভেসে উঠত, সে চিত্র সেই রাতেই মসীময় হয়ে উঠেছিল। বিশাখার কচি মন বিদ্রোহ করল।

তারপর ঐ লোকটিকে আর কখনও দেখেনি। যেদিন অবিনাশ এসে মিশিরের উপস্থিতি আর দাবীর কথা বলল সেদিন বিশাখা কঠিন ভাবে মিশিরের দাবীকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। কৈশরের সীমান্তে এসেই জেনেছিল, মিশির নামক একটি ব্যক্তি পুরাতন শহরে বাস করে, তারই সাথে তার বিয়ে হয়েছিল। নব যৌবন উন্মেষের সাথে সাথে স্বামী সম্বন্ধে তার জ্ঞান জন্মেছিল, তাই মিশির সম্বন্ধে আগ্রহও জেগেছিল। ওপারে পুরাতন শহরে যারা যাতায়াত করত তাদের কাছেই সংবাদ সংগ্রহ করেছিল। তারাই জানিয়েছিল, খেতুরের মেলা থেকে মিশির সৌদামিনী নামে বৈষ্ণবীকে কিনে এনেছে তার আস্তানায়। সৌদামিনীর সাথে মিশির স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করছে।

বিশাখা প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি এসব গুজব। জন্মাষ্টমীর মেলায় সৌদামিনী পূজা দিতে এসেছিল শ্যামের মন্দিরে। তার সাথে এসেছিল অপরূপা সুন্দরী একটি বধু। শ্যামের মন্দিরে বিশাখা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রসাদ বিতরণ দেখছিল। সুন্দরী বধুটি এসে তাকে প্রণাম করল, বিশাখা জিজ্ঞাসা করল, কোথা থেকে আসছ গো ?

বধুটি বলেছিল, ওপারের গয়লা বাড়ি থেকে, আমি পদ্ম।

সহচরী সৌদামিনী বলল, নেতাই গয়লার বউ। মানত নিয়ে এসেছে।

তুমি কে ?

সৌদমিনা জবাব দেয় নি। জবাব দিয়েছিল পদ্ম। বলেছিল, মিশিরের জলপাত্তর।

জলপাত্তর ! রক্ষিতা ! বিশাখার কর্ণমূল পর্যন্ত রাঙা হয়ে উঠল। দৌড়ে মন্দিরের ভেতর এসে নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচল।

তাই অবিনাশের সামনে তার দৃঢ়তা ফুটে উঠেছিল। অবিনাশ এ সংবাদ জানতো। সেও বিশাখার দৃঢ়তায় আনন্দিত হয়েছিল। বিশাখা যে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে এই টুকুই সম্বল নিয়ে অবিনাশ এপারের দেনা পাওনা মিটিয়েছে। গাওনা আর হয়নি, বিশাখাকে মিশিরের ঘর করতে হয়নি ঐই যথেষ্ট।

বিশাখা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। সরকার মশাই এসে তাকে ডেকে তুলল।

বিশাখা উঠে বসে বসল, বলল, সরকার মশায়, আমি ভাবছি ডাক্তারী পড়ব।

ডাক্তারী! মেয়েছেলে ডাক্তার হবে এমন অদ্ভুদ চিন্তা সরকারের মাথায় কোন দিনই প্রবেশ করেনি। আশ্চর্য হয়ে বলল, তুমি যে কলেজে পড়বে বলেছিলে।

আগে তাই ভেবেছিলাম। ভেবে দেখলাম ওতে দেরী হবে আর বি-এ, এম-এ, পাশ করার গৌরব থাকলেও তাতে অপরের কোন উপকার হবে না। তাই মত বদলেছি।

সরকার ক্ষুন্নভাবে বলল, কি হবে ডাক্তারী পড়ে। যা পড়েছ তারই দাম কে দেয়! তোমার অভাব কোথায়?

অভাব! বিশাখা চমকে উঠল।

কি বললেন, অভাব! বিশাখার মুখের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠল। শক্ত কথা বলার স্পৃহা দমন করে বলল, সে কথা আপনি বুঝবেন না। যদি বিরাট অভাব থাকতো আর যদি পথটা থাকতো খোলা তাহলে অভাবকে অভাব মনে করতাম না। কিন্তু সামান্য অভাব মোচনের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট প্রাচীর। ওসব আপনি বুঝবেন না সরকার মশায়। যদি ডাক্তার হয়ে সংসারে এসে দাঁড়াতে পারি, মানুষের সাথে নিজেকে মিলিয়ে দিতে পারি তা হলেই অভাবকে ভুলতে পারব কর্মের উন্মাদনায়।

ডাক্তারী স্কুলে ভর্তি হয়ে এসে বিশাখা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সরকার মশায় বিনীত ভাবে গৃহ প্রত্যাগমনের অনুমতি প্রার্থনা করল।

এতো তাড়াতাড়ি কেন?

তোমার জেঠিমার হাঁপানী রোগ তাতো জানো। বেশি দিন তাকে একা রাখা কি সম্ভব। আগে জানলে তাকেও সাথে নিয়ে আসতাম।

বিশাখা কৌতুক অনুভব করল। সরকার মশায়ের চল্লিশ বৎসরের সঙ্গিনী। কত আপনার করে ভেবে নিয়েছে তাকে। বিশাখার ঠোঁটে হাসির অস্পষ্ট রেখা। বলল, বেশ, কালকেই রওনা হবেন।

পরদিন বিদায় নিয়ে সরকার মশায় রিক্সায় উঠে বসল। বিশাখা বলল, পৌঁছেই চিঠি দেবেন। ভুলবেন না যেন।

মমতা করুণ দৃষ্টিতে বিশাখার দিকে তাকিয়ে সরকার মশায় বলল, আচ্ছা।

রিক্সা চলে যাবার পর বিশাখা দরজার চৌকাট ধরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অজ্ঞাতে কয়েক বিন্দু অশ্রু গাল বেয়ে নেমে এল।

পাঁচ বছর পর যেদিন মেডিকেল স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিয়ে বিশাখা বাসায় এসে হাত পা ছড়িয়ে বসল, সেইদিন-ই সে প্রথম উপলব্ধি করল, বাধাহীনভাবে তার বয়স এগিয়ে গিয়েছে, পদচিহ্ন রেখে গেছে তার দেহে ও মনে। সময়ের ছেদহীন গতি তার দেহ ও মনে যথেষ্ট পরিবর্তন এনে দিয়েছে তার অজ্ঞাতে। কপালের ওপর থেকে অগোছালো চুলের গোছা সরিয়ে আরসীর সামনে এসে দাঁড়াল। নিজের চেহারাকে ভাল করে দেখে নিল। বিগত পাঁচ বছরে পাঁচটি দিনও সে নিজের কথা ভাববার অবসর পায়নি আজ ভাবতে বসে আরসীতে নিজের চেহারা দেখে চমকে উঠল।

অতিক্রান্ত পাঁচবছরের ইতিহাস কেবলমাত্র সাধনার ইতিহাস। একটি নির্জন কক্ষে বসে দিনের পর দিন রাতের পর রাত পাঠ্যসূচীর মাঝে নিজেকে একান্তভাবে ডুবিয়ে দিয়েছে, অপরের উপস্থিতি তার বিরক্তি উৎপাদন করেছে, অপরের গভীর স্নেহকে তিরস্কার বলে মনে করেছে, সবই ছায়াবাজির ছায়ার মতো এসেছে গেছে কিন্তু কেউই মনের উপর রেখাপাত করতে পারে নি।

সরকার মশায় মাঝে মাঝেই এসেছে। কথাপ্রসঙ্গে জোতগাঁয়ের কথা বলতে গেলেই বাধা দিয়ে বলেছে, এখনও ওসব কথা শোনবার সময় হয়নি।

যেদিন ডাক্তারী স্কুলে ভর্তির ইণ্টারভিউ হচ্ছিল, বিশাখা দুরু দুরু বক্ষে পরীক্ষকের সামনে এসে দাঁড়াতেই প্রথম প্রশ্ন শুনতে পেল, তুমি ডাক্তারী পড়ে কি করবে ?

বিশাখা অস্ফুটস্বরে বলল, সেবা।

দ্বিতীয় পরীক্ষক বললেন তারতো আরও পথ আছে।

হয়ত আছে ; কিন্তু আমাদের দেশে কত শিশু এককোঁটা ওষুধের অভাবে মারা যায় আমি তাদের সেবা করতে চাই। অর্থের অভাব আমার নেই অর্থ উপার্জনও আমার কাম্য নয়।

বিশাখা পাশ করে এসেছিল সেদিন।

চার বছরের পড়া সে পাঁচ বছরে শেষ করেছে তাতেও সে ক্ষুব্ধ নয়। আরও ভাল করে শেখবার প্রেরণা তাকে হাসপাতালের অবৈতনিক চিকিৎসকের পদে টেনে নিয়ে এল।

পাঠ্যজীবনের সঙ্গী অমিতাকে একদিন বিশাখা জিজ্ঞাসা করেছিল, তুই ডাক্তারী পড়তে এসেছিস কেন?

অমিতা হেসে উত্তর দিয়েছিল, চয়েস অফ প্রফেশান। মানুষের জীবনে অর্থ হল মুখ্য, তাকে পেতে হলে প্রফেশান চয়েস করতে হয়।

বিশাখা বলেছিল, তা ঠিকই। যারা ডাক্তারী পড়তে আসে তারা ধনী হবার আকাঙ্খা নিয়েই আসে। পিতামাতা তাদের কানে টাকার মিঠে বোল শোনায়, তারা ঘুণাক্ষরেও জানতে দেয়না, ডাক্তার হল সমাজের শ্রেষ্ঠ সেবক। তাই ঘটি বাটি বিক্রী করে আতুর পিতামাতা সন্তানকে নীরোগ করতে চায়। বিক্রীত ঘটি বাটির টাকা উঠে আসে চিকিৎসকের পকেটে। সেই টাকার গায়ে যে অশ্রুর ছাপ তা তারা দেখতে পায় না।

অমিতা বিশাখার দার্শনিক তথ্য শুনে হো হো করে হেসে উঠল। বলল তোর জন্ম হওয়া উচিত ছিল পাঁচশো বছর আগে। সেদিন টাকা মাটি, মাটি টাকা চিৎকার করলে কয়েক হাজার ভক্ত জুটতো তোর। এ যুগে তোর বুদ্ধি অচল। যেখানে সবাই বাঁচতে চায়, সেখানে বাঁচাটা নির্ভর করে যোগ্যতার ওপর আর বাঁচবার প্রচেষ্টায়।

বিশাখা কথা বাড়ায় নি। পাঁচশত বছরের পেছনকার মনটা তার ঘুমিয়ে পড়েনি বলেই সে গর্ববোধ করে।

পাঁচ বছরের পর আরও এক বছর কেটে যায়। সকাল সন্ধ্যায় হাসপাতাল পাহারা দিয়ে একদিন বিদায় নেবার দিন এল। আসবার দিন কেউ অভ্যর্থনা জানায়নি, যাবার বেলাতেও সম্ভাষণ জানাবার কেই নেই।

ধীর পদক্ষেপে বিশাখা বেরিয়ে এল তার ছয় বছরের স্মৃতিপূর্ণ পরিবেশ থেকে। কত মানুষকে হাসতে হাসতে ফিরতে দেখেছে এখান থেকে, কত মানুষকে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে বের হতে দেখেছে, কত মানুষ আশীর্ব্বাদ জানিয়েছে, কত মানুষ জানিয়েছে অভিশাপ। ভাল মন্দ নিয়ে গড়ে ওঠা ছয় বছরের এই পরিবেশকে ছেড়ে যেতে সত্যিই তার দুঃখ হচ্ছিল। এনাটমি পড়তে গিয়ে মৃত দেহের দিকে তাকিয়ে সে ভয় পায়নি। ইন্দ্রনাথের কথা

মনে হয়েছে, মরার কোন জাত নেই। শুধু জাত নেই বললেই শেষ কথা নয়, মরা মানুষ আর তাজা মানুষের কোন তফাৎ নেই, কতকগুলো যন্ত্র শুধু বিকল হয়ে গেছে। যে মানুষ কদিন আগে হেসে খেলে বেড়িয়েছে, স্বপ্নের সৌধ গড়েছে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায়, সেই মানুষ আজ নিশ্চল হয়ে শুয়ে রয়েছে জীবনের সব কিছু ভুলে। একটু ছুঁচ ফুটলে যে আর্তনাদ করেছে, সেই আজ ক্ষুরাধার ছুরিকার আঘাতে খণ্ড বিখণ্ড হচ্ছে, কোন বিকার নেই, কোন আবেদন নাই। তফাৎ এইটুকু।

সব কিছু পেছনে রেখে বিশাখা উঠল নিজের বাসায়।

বিকেলবেলায় এল অমিতা, সঙ্গে এল সলিল।

দুজনকে বসতে দিয়ে বিশাখা দাঁড়িয়ে রইল।

অমিতা বলল, তুইও বোস। এ হচ্ছে সলিল ঘোষ। এবার চাকরি পেয়েছে কলেজের মাষ্টারী।

বিশাখা হঠাৎ বলে উঠল, অর্থাৎ!

অর্থাৎ যে কি তা কেউ মুখে প্রকাশ না করলেও উভয়ের চোখের দীপ্তি আর গালের রঙ অর্থাৎ-এর অর্থ বুঝিয়ে দিল।

অমিতা হাসল। বলল, শুনলাম তুই নাকি সরকারি চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছিস।

এখনো ঠিক করিনি। হয়ত যেতে হবে। তার আগে একবার দেশে যাব। ছবছরে একদিনও দেশে যাইনি। সেই নদী, সেই আমের বাগান, সেই শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ, এসব ভুলে তপস্যা করেছি, তপস্যা শেষ হয়েছে, ফল প্রাপ্তি ঘটেছে, এবার ফিরে যাব সেই পুরাতন পরিবেশে। বাড়ীওয়ালাকে নোটিশ দিয়েছি, সরকার মশাইকে আসতে লিখেছি।

আমরা একটা প্রোপোস্যাল নিয়ে এসেছি।

এনগেজমেণ্টের?

সেটা তো পরের, আগে রাগ, তারপর অনুরাগ তারপর,

তারপর বিরহ।

সেই জ্বালা যাতে সহ্য করতে না হয় তার জন্যই প্রোপোস্যাল। আমরা তোর সাথে তোর দেশে যাব বেড়াতে।

সে তো আনন্দের কথা। কিন্তু থাকতে পারবি কি সেখানে?

চিকিৎসকের বৃত্তি যাদের তারা স্থানের বিচার করে না।

বেশ প্রস্তুত হয়ে নিস। চার পাঁচদিনের মধ্যেই কিন্তু যেতে হবে, অবশ্য যদি আমার সাথে যেতে চাস।

নির্দ্দিষ্ট দিনে অমিতা এল, এলনা সলিল। সলিল কথা দিয়েছে দু'এক দিনেই সে পৌঁছাবে। পরীক্ষার খাতা দেখা শেষ করে তবে তার ছুটি।

বিশাখা জিজ্ঞাসা করল, সোজা ট্রেনে যাবি, না ট্রেন-ষ্টীমার হয়ে যাবি। না, ট্রেনে নৌকায় যাবি ?

তোর যাতে সুবিধা।

আমার সব কিছুতেই সুবিধা। আজ ছবছর পর দেশে যাচ্ছি। সরকার মশায় গোদাগাড়িতে নৌকা রাখতে বলে এসেছেন। কিন্তু উজানী নৌকায় দেরী হবে বেশি। তার চেয়ে ট্রেন আর ষ্টীমারেই তাড়াতাড়ি হবে।

অমিতাকে তার বাবা গাড়িতে তুলে দিয়ে গেল। সলিলও এসেছিল ষ্টেশনে। তারপর সে তার অনিচ্ছাকৃত অক্ষমতার কথা বলে ত্রুটি স্বীকার করতে লাগল। বিশাখা কোন কথা না বলে নিশ্চল ভাবে বসে রইল। কলকাকলি মুখর অমিতা ট্রেন ছাড়ার সাথে সাথেই মূক হয়ে গেল। সরকার মশায় উসখুস করতে করতে চুপ করে বসতে বাধ্য হল।

ভোর বেলায় গাড়ি যখন এসে দাঁড়াল লালগোলা ঘাটে তখন অমিতা প্রথম কথা বলল, সারারাত একটুও ঘুমোতে পারিনি।

বিশাখা হেসে বলল, ঘুমের ওষুধ রেখে এসেছিস, ঘুম হবে কোত্থেকে! রাগ, অনুরাগের পর হল বিরহ। বিরহ সুখ, বিরহ আনন্দ, বিরহ নতুন জীবনের পাথেয়। লাভ লোকসানের হিসেবের খাতায় পাথেয় লিখতে লিখতে রাত কেটে গেছে, ঘুম আর আসেনি।

অমিতা শুধু হাসল।

হুরমুর করে তখন যাত্রীর দল নামতে শুরু করেছে। কথা বলবার অবসর ছিল না। সরকার মশায় বিশাখা আর অমিতাকে নিয়ে এসে উঠল ষ্টীমারে। অমিতা এই প্রথম কোলকাতার বাইরে এসেছে। গোটা রাস্তা ঝিমোতে ঝিমোতে এসেছে, বাংলা দেশের আসল চেহারা দেখতে পায়নি। ষ্টীমারে উঠে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল। পদ্মার বিরাটত্ব শঙ্কা মিশ্রিত শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলে তার মনে।

বিশাখা বলল, কি দেখছিস অতো ?

এত বড় নদী ! দেখ দেখ, কেমন সুন্দর লাগছে ঐ ছোট ছোট নৌকা গুলো। লোকগুলোর কি সাহস। এ-টুকু নৌকা নিয়ে এত বড় নদীর বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে ।

বিশাখা হাসল। অমিতার চোখ দুটোতে যেন পৃথিবীর সৌন্দর্য ভাণ্ডারের কয়েকটি বিন্দু পান করবার জন্য ব্যগ্রতা ফুটে বের হচ্ছিল ।

নদী পেরিয়ে মিটার গেজের গাড়িতে আশ্রয় নিয়ে খাওয়া দাওয়া শেষ করে নিল। অমিতা ভাল করে জানালার ধারে বসল। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল উন্মুক্ত পৃথিবীকে। মাটির রঙ্ ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। গাড়ি ক্রমশই যেন উঁচু শক্ত মাটির বুক কেটে ছুটে চলেছে। কোথাও সবুজ বৃক্ষাচ্ছাদিত গ্রাম, কোথাও মাঠের মাঝে কয়েকটি তাল গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কোথাও রয়েছে বিরাট জলাভূমি। কতকগুলো ছোট ছোট নদী, নদীর বুকে লৌহসেতু গাড়ির ঝাঁকুনিতে ঝন্ ঝন্ করে উঠছে।

এগারটা না বাজতেই পুরাতন শহরে এসে গাড়ি দাঁড়াল। বিশাখার চোখ ঘুরছে প্ল্যাটফরমের এ কোনায় সে কোনায়। কাকে যেন তার চোখ খুঁজে বেড়াচ্ছিল, কিন্তু কাউকে সে পেল না।

অমিতা জিজ্ঞাসা করল, আর কতদূর ?

দূর আর নেই। নদী পার হলেই আমাদের বাড়ি।

যাই বলিস, তোর বাড়ি কিন্তু অনেক দূর।

কোলকাতা থেকে। চব্বিশপরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী পেরিয়ে আসতে হয়েছে। দূরতো বটেই।

অমিতাকে কেমন মন মরা মনে হল। বিশাখা জিজ্ঞাসা করল, সলিলকে ছেড়ে এসে মন ছটফট করছে বুঝি। সলিল এসে যাবে শীগ্গির। যতদিন না আসে ততদিনই তো আনন্দের।

বিশাখা যা ভেবেছিল তা হয় নি। ষ্টেশনের প্লাটফরমে না এলেও আশা করছিল রাধানাথ বাড়িতে এসে দেখা করবে। তার আগমন সংবাদ রাধানাথের কাছে নিশ্চয়ই পৌঁছেছে। গত ছয় বৎসরে রাধানাথ তাকে একখানা পত্রও দেয়নি, কোলকাতা গিয়ে দেখা করাতো দূরের কথা। সন্ধ্যা পর্যন্ত রাধানাথ না আসাতে সেও ইচ্ছে করেই মন্দিরে যায়নি। মন্দিরের কাঁসর ঘণ্টা বেজে

উঠলেও সেদিকে পা বাড়ায়নি। অমিতা তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল, বলেছিল, চল তোদের ঠাকুরবাড়ি দেখে আসি। বিশাখা যেতে রাজি হয়নি। বলেছিল, কাল যাব, আজ বড় ক্লান্ত। রাতের বেলায় ভ্রমন তালিকা প্রস্তুত করতে করতে বিশাখা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। হঠাৎ ঝড়ে যেমন কাঁচা খুটির ঘরের চাল উড়ে গিয়ে কঙ্কালের মত খুঁটিগুলো দাঁড়িয়ে থাকে, জানাতে থাকে তার অক্ষম চেষ্টার কথা, তেমনি প্রবল আঘাতে অক্ষম খুঁটির মত বিশাখা নিরাশার প্রতীক হয়ে দাঁড়াল, যখন অমিতা জিজ্ঞাসা করল, বিশা, এত দেখলাম, কিন্তু তোর মতো দেখিনি। তোর মনটা যেন পাথর দিয়ে গড়া। সন্দীপ ডাক্তার তোর জন্য তো পাগলের মত হয়ে গেছে, তুই একবার তাকিয়েও দেখলি না।

বিশাখা উত্তর দিতে পারল না। চুপ করে শুয়ে রইল, তখন প্রবল ঝড় বইছে তার মনে।

অমিতা বলল, তুই বুঝি কাউকে ভালবাসিস ?

বিশাখা তবুও কথা বলল না।

অমিতাও ছাড়বার পাত্রী নয়, আবার বলল, অতো নিষ্ঠা ভাল নয়। পথ চলতে যা কিছু কুড়িয়ে পাওয়া যায় সেটাই লাভ।

বিশাখা মৃদুকণ্ঠে বলল, সব জানি ভাই, কিন্তু আমার যে বিয়ে হয়ে গেছে।

অমিতা আশ্চর্য হয়ে বলল, তোর বিয়ে হয়ে গেছে !

হয়েছিল। আজ থেকে ষোল বছর আগে, যখন আমার বয়স নয় বৎসর।

তারপর ?

সে বিয়ে বিবাহিত জীবনের সন্ধান দেয়নি। আইন আমাকে বিচ্ছিন্ন হতে সুযোগ দিয়েছে, ভালবাসবার অবসর দেয়নি। বিবাহকে না জেনেও বিবাহের আইনগত বাধ্যবাধকতা মানতে হয়েছে।

ঠিক বুঝলাম না।

আর বুঝে কাজ নেই। সলিল এলে তার কাছ থেকে বুঝে নিস। পণ্ডিত লোক বোঝাবে ভাল।

সেইরাত্রে দুইবন্ধু পাশাপাশি শুয়ে ভ্রমন তালিকা প্রস্তুত করে নিল। সলিল এলেই তারা ভ্রমনে বের হবে তাও নিশ্চিত করে রাখল।

একদিন দুদিন করে সাতদিন পেরিয়ে গেল, সলিল কিন্তু এল না।

অমিতার অমিত উৎসাহে ভাটা পড়ল। কয়েকদিন অস্থিরভাবে ঘর বাহির করে অমিতা বলল, এবার কোলকাতা ফিরতে হবে।

কেন ? পাখি উড়ে যাবার ভয়ে।

তা নয়, সলিল এল না, চিঠিও দিল না। তাই ভাবছি।

আর ভেবে কাজ নেই, এবার আমরা দুজন বেরিয়ে পড়ি। ভ্রমন কার্য সমাধা করে দুজনেই রওনা হব কোলকাতায় তারপর স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে।

শেষরাতে দুখানা গোযানে রওনা হল তারা। একখানায় সরকার মশায়ের সাথে একজন কিষান, আরেকখানায় বিশাখা আর অমিতা।

বেলা দশটা নাগাদ গোযান এসে দাঁড়াল পিয়াসদিঘীর সামনে। গাড়োয়ানরা গাড়ি ছেড়ে দিয়ে গোরু নিয়ে দিঘীতে নামল। বিশাখা আর অমিতা দিঘীর ঘাটে পা ঝুলিয়ে বসতেই সরকার মশায় খাবারের ব্যবস্থায় লেগে গেল।

অমিতা বলল, এতবড় দিঘী থাকতে এটা পিয়াস বাড়ি কেন ?

সুলতানের আস্তাবল ছিল এখানে। পিয়াসী ঘোড়ারা জল খেত এই দিঘীতে। কেউ কেউ বলে, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত মানুষকে রাখা হোত দিঘীর কিনারায় ছোট্ট ঘরে বন্দী করে। তাকে দেওয়া হত না কোন আহার্য অথবা পানীয় অথচ সামনে থাকত পিপাসা মেটাবার অফুরন্ত জলের এই দিঘী। বন্দী পিপাসায় গলা শুকিয়ে মরত, খেতে পেত না এক ফোঁটা জল। তাই এর নাম পিয়াস বাড়ি। কোনটা যে সত্যি কে জানে। ঐযে পাথরের থাম্বা দেখছিস, কেউ বলে ওখানে ফাঁসি দেওয়া হত, কেউ বলে এটা ছিল ওমরাহদের বাড়ি। বাংলার ইতিহাস ঠিক করে কেউ লিখে রাখেনি। সবই অস্পষ্ট। শুধু ইতিহাস নয়, বাংলার মানুষও যেন অস্পষ্ট রয়ে গেছে এতকাল।

অমিতা শুনতে শুনতে ঝিমিয়ে পড়েছিল। দিঘীর জলে পা দিয়ে চুপ করে বসে ভাবছিল। হঠাৎ বলল, এমন তো হতে পারে, কোন পিয়াসী মন এখানে এসে পরিতৃপ্তি খুঁজে পেয়েছিল অথবা পায়নি।

অসম্ভব নয়।

হয়ত কোন খদিজা বেগম কোন জব্বরআলির জন্য অপেক্ষা করত এই ঘাটের কিনারায়। এপারে খদিজার শিবিকা এসে দাঁড়াত, খদিজা নামত

নাইতে, ওপারে ঐ তমাল গাছের তলায় বসে বাঁশী বাজাত রাখাল যুবক জব্বরআলি। তারপর একদিন চোখে চোখ দিয়ে মনচুরি হয়ে গেল দুজনেরই। রাখাল যুবকের সাথে খানদানি ঘরের মেয়ের প্রেম, সমাজ সহ্য করতে পারল না, পিতা মাতা বাধা সৃষ্টি করল। মধ্যযুগীয় কায়দায় জব্বরআলিকে কোন গুপ্ত ঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে হল। খদিজা কোন খবরই রাখত না। রোজকার মত সেদিনও নাইতে এসেছিল। তার পিয়াসী চোখ ছিল ওপারের ঐ তমাল তলায়। জব্বর আর এল না, খদিজা বাঁশীর আওয়াজ শুনতে পেল না। সারাদিন অপেক্ষা করে সূর্য ডুবতেই খদিজা ফিরে গেল তার গৃহে। একদিন দুদিন করতে করতে অনেকদিন পেরিয়ে গেল। রোজই উন্মুখ হয়ে খদিজা আসত আর নিরাশ হয়ে ফিরে যেত। প্রেম পিপাসা তার নিবৃত্ত হয়নি, দয়িতকে সে খুঁজে পায়নি, একদিন নাইতে এসে সেও ফিরে গেলনা তার গৃহে। পরের দিন খদিজার রেশমী চুলের গোছা দেখা গেল দিঘীর বুকে, পথচারী ঝাঁপিয়ে পড়ল দিঘীতে। টেনে তুলল তার মৃতদেহ। পিয়াসী খদিজার পিয়াস মেটাতে পারেনি বলেই এর নাম দেওয়া হয়েছিল পিয়াসদিঘী।

অমিতার কথা শেষ হতে না হতেই বিশাখা হো-হো করে হেসে উঠল। বেশ কাহিনী গড়ে তুলেছিস, তোকে ধন্যবাদ। তোর মনের ছবি দিঘীর শান্ত শীতল কাঁচের মত জলে দেখতে পাচ্ছিস বুঝি।

অমিতা উদাসভাবে বলল, কে জানে।

গৌড় দুর্গের প্রথম প্রাচীর পেরিয়ে এসেছে অনেকক্ষণ, পিয়াসবাড়ি ছেড়ে আরও এগিয়ে চলল তাদের গোযান।

গাড়ি এসে দাঁড়াল রামকেলীর তমাল তলে।

প্রভু এই তমাল তলে বিশ্রাম করেছিলেন, এখানেই রূপ-সনাতন প্রভুর সেবা করে ধন্য হয়েছিলেন। প্রভুর পায়ের ছাপ এঁকে রেখেছিলেন পাথরের ফালিতে। সামনেই দিঘী। দিঘীর বাঁধানো ঘাটের ওপর আমগাছের ছায়া নেমে এসেছে। দুজনে গিয়ে বসল ঘাটে। দুজনেই চেয়ে রইল ওপারের কলাবাগানের দিকে।

বিশাখা ডাকল, অমি।

উঁঃ।

কি ভাবছিস ?

ভাবছি। ভাবছি নদের চাঁদকে। শচীমাতা ডাকে নিমাই নিমাই, প্রতিধ্বনি বলে, নাই নাই। নদের নিমাই আজ আর নাই। শচীমাতার কণ্ঠস্বর আজ আর শোনা যাচ্ছে না। কয়েকলক্ষ লোকের বাসভূমি আজ যেমন শ্মশানের শূণ্যতায় পরিণত হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণের দেবতাও তেমনি শূণ্যতা সৃষ্টি করে রেখেছে মনোজগতে। তাই ভাবছি।

শুনতে পাচ্ছিস বিশাখা? কার পদধ্বনি যেন শোনা যাচ্ছে। জনহীন এই বনভূমিতে কে আসবে বল্। ঐ যে শণ্‌শণিয়ে উঠছে বাতাস, ঐ যে বনান্তরাল থেকে গোধনের হাম্বারব ভেসে আসছে, ঐ যে কদলীবৃক্ষের ছত্রছায়ে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে গোবৎস, ঐ সবই তার আগমন কথা ঘোষণা করছে। প্রভু আসছেন।

শঙ্কিত ভাবে বিশাখা বলল, কি বলছিস অমি, তোর মাথা খারাপ হয়নি তো।

অমিতা হেসে উঠল। আনন্দের হাসি, তার সঙ্গী হল অশ্রু। চুপ করে থেকে অমিতা বিশাখার মুখের ওপর তার পটল চেরা নয়ন দুটো স্থাপন করে বলল, মাথা খারাপ হয়নি বিশাখা। আমি ফিরে চলে গেছি পাঁচশত বৎসর আগে। আমি যেন চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছি। নুপুরের তালে তালে মৃদঙ্গ বাজছে, করতালের ঠুন্ ঠুন্ শব্দ উঠছে, প্রভু পেরিয়ে চলেছেন গৌড়ের রাজপথ, এই সেই রাজপথ। যে পথের ধূলায় মানুষ খুঁজেছে প্রভুর পদরেণু, এই সেই পথ। রূপ সনাতন ধন্য, ধন্য তাদেব জন্ম, ধন্য তাদের কর্ম। নইলে প্রভু কি আসতেন কখনও এই পথে। প্রেমের ঠাকুর এসেছিলেন প্রেমিকের আকুল আহ্বানে। জানিস বিশাখা, আজকের মানুষ যদি সেদিন থাকত তাহলে সেই অবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে পারত কি না, কে জানে। মনে হচ্ছে, আমি যদি সেদিন থাকতাম গৌড় নগরের কোন গৃহাভ্যন্তরে। প্রভু যেতেন এই পথে, আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম গবাক্ষে, সেই গৌর বরণ দেখে জীবনকে ধন্য করতে পারতাম।

অমিতা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বলল, চল এবার পায়ে হেঁটে এগোতে থাকি। মসজিদ মিনারের ধ্বংসস্তূপ দেখতে যারা আসে তারা শিল্পী নয়, তারা অতীতের দম্ভের সাথে নিজের মনের দম্ভ মিশিয়ে দিতে চায়। এতেই তারা পরিতৃপ্তি পায়। আমি পরিতৃপ্তি খুঁজছি এই বন-বাদাড়ে যেখানে এককালে বাস করত কতকগুলো মানুষ যাদের

আশা আকাঙ্খা ছিল আকাশভেদী অথচ তারা লুইয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিল মহাকালের পায়ের তলায়। অতীতের সেই মানুষগুলোকে দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে, তারা যদি দল বেঁধে এসে বলত, আমরাই সে দিনের মানুষ, আমরাই মনে করেছিলাম ভোগ হবে জীবনের সবচেয়ে বড় আশ্রয় তা হলে সুখী হতাম।

বিশাখা অমিতার হাত ধরে টানতে টানতে এগিয়ে চলল। বলল, ভাবাবেগ মানুষের জীবনে মূল্যবান নয় একথাই তো এতকাল আমাকে বলে এসেছিস, আজকে যা বলছিস তার সাথে সেদিনকার কথার কোন মিল নেই।

সেদিন চোখেরসামনে ছিল কোলকাতা, কোলকাতার বিলাস, কোলকাতার প্রলোভন, কোলকাতার যান্ত্রিক জীবনের আকর্ষণ, কোলকাতার হৃদয়হীন পরিবেশ, তাই সেদিন যা ভেবেছি আজ আর তা ভাবতে পারছিনা। পৃথিবী যে কত সুন্দর তা ভাল করে দেখছি। মানুষ যদি সুন্দর না হোত, এমন সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে সে পারত না পৃথিবীর বুকে। যে সুন্দর নয় সে কোনকালেই সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারে না। যে প্রেমিক নয় সে প্রেমকে শ্রদ্ধা করতে পারে না, যার মনে সঙ্গীতের তরঙ্গ ওঠেনা, সে সঙ্গীতের রূপদান করতে পারে না। অতীতের এই মানুষগুলো যেমন ছিল হৃদয়হীন ভোগ সর্ব্বস্ব তেমনি তাদের ছিল সৌন্দর্য ভরা একটা হৃদয়। যে হৃদয় সৃষ্টি করতে পেরেছিল এমন গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য আর দ্যুতিময় প্রাসাদ।

বিশাখা বাধা দিয়ে ডাকল, অমি।

কেন ?

দুপুর পেরিয়ে গেছে। আরও দেখবার রয়েছে। এভাবে চললে কদিন যে লাগবে কে বলতে পারে।

থেকে যাব এখানে। ডাক-বাংলো রয়েছে। বেশ হবে। মনের কোণায় রইবে গৌড়ের এক রাত্রির স্মৃতি। যেখানে সুলতান সুবাদাররা বছরের পর বছর কাটিয়েছে, সেখানে একদিন বাস করবার সৌভাগ্য হওয়া কি কম কথা।

চিন্তিতভাবে বিশাখা বলল, তোর যা অবস্থা, রাতের বেলায় ভূত দেখবি। মোগল পাঠান, খোজা হাবসী, হিন্দু মুসলমানের ভূতগুলো ভীড় করে দাঁড়াবে ডাক-বাংলোর বারান্দায়। তুই ইণ্টারভিউ নিতে থাকবি আর সারারাত আমাকে শঙ্কায় কাটাতে হবে। ওসব দরকার নেই, ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে যাই, তাই ভাল হবে, বুঝলি। দেখার কাজ তাড়াতাড়ি শেষ কর।

অমিতা নীরবে চলতে লাগল।

মসজিদ মিনার পেরিয়ে এসে দাঁড়াল লুকোচুরি দরওয়াজাতে।

দুর্গের দক্ষিণদ্বার পাহারা দিচ্ছে এই বিরাট দরওয়াজা।

কে তৈরী করেছিল এটা ?

সুবেদার শাহ সুজা।

শাহজাহানের সৌন্দর্যপ্রীতি এর সাথে জড়িয়ে আছে কি ?

হয়ত আছে। সে প্রীতি না থাকলেও সে মনটা ছিল। বেগমদের সাথে লুকোচুরি খেলত সুবেদার স্বয়ং।

চমৎকার !

চমৎকার !

অমিতা শুধু হাসল।

জীবনভোর সুজা লুকোচুরি খেলেই গেছে। খেলা সাঙ্গ হয়েছে, পায়নি খুঁজে সেই লুকিয়ে থাকা মানুষটিকে।

আবার ভাবাবেগ ?

অমিতা হাসল। এ হাসিতে তার মনের বিষাদকরুণ প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠল। বলল, মানুষের জীবন নিয়ে যাদের খেলতে হয় তারা শুধু রাজা বাদশা হয় না তারা ডাক্তারও হয়। আমরা ডাক্তার। মানুষকে নিয়ে খেলচি খেলব, এ খেলার তলায় খুঁজে পাবার আকর্ষণ থাকবে না, অথচ খেলা সাঙ্গ হবে একদিন। লুকিয়ে থাকা তখনও শেষ হবেনা।

পাহারা মহলের সিঁড়িতে হেলান দিয়ে বসল অমিতা, উল্টো দিকের সিঁড়িতে বসল বিশাখা। দুজনেই ভাবছে।

বিশাখা বলল, বড়ই ক্লান্ত, এবার বিশ্রাম।

অমিতা চোখ বুঁজে যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইল।

খিল্-খিল্-খিল্।

মধুঝরা হাসির শব্দ।

কে ?

পিয়ারা বাণু !

তাই বল।

রূপ ও রূপার অধিশ্বরী, সুবে বাংলার সাম্রাজ্ঞী।

তুমি এখানে কেন?

আমরা চলে যাচ্ছি।

কোথায়?

দিল্লিতে, ময়ুর সিংহাসন হাতছানি দিচ্ছে।

তুমি যেওনা পিয়ারা, বাংলার মাটিতে নিজের সব কিছু মিশিয়ে দাও। এমন সুন্দর দেশ আর কোথাও পাবেনা।

ময়ুর সিংহাসন আরও সুন্দর।

আবার কে কাঁদে?

পিয়ারা বাণু।

কাঁদছ কেন পিয়ারা?

পালিয়ে এলাম। দিল্লি বহুত্ দুর হ্যায়।

এসেছ যখন বসো।

না আরও দুরে যেতে হবে। গৌড়ের ইঁট কাঠ পাথর আটকে রাখতে পারবে না। মানুষ নিজেকে ভালবাসে সব চেয়ে বেশী। ভালবাসাই তাকে খুঁজে বের করতে বলে নিরাপদ আশ্রয়।

তবুও কাঁদছ কেন?

আজই যেতে হবে। ঐযে দেখছ সিঁড়ি মহল ওখানে আমি খেলতাম। সুবেদার দাঁড়িয়ে থাকত পাহারা মহলে। ছুটে এসে জাপটে ধরত সিঁড়ির বাঁকে। কেউ থাকত না সেখানে। তার গোলাপী ঠোঁট ছুইয়ে দিত আমার গোলাপী গালে। ঐ যে দেখছ চবুতরা, ওখানে বসতাম আমরা দুজনে, বাঁদিরা চামর দোলাতো, আমরা হেসেই গড়িয়ে পড়তাম। ঐযে দেখছ প্রাচীর, ওখানে সুবেদার সোয়ারী বেশে এসে দাঁড়াত আমি হারেম থেকে তাকিয়ে থাকতাম তার দিকে। ঐ যে ওখানে দিঘী, ওখানে মাঝে মাঝে যেতাম। পাথরের কুচি ছুড়ে মারতাম দিঘীর জলে। দিঘীর বুকে ঢেউ উঠত। ঢেউ ভেঙ্গে এসে পড়ত আমাদের পায়ে। এই সব ছেড়ে পালাতে হবে আজই।

পিয়ারা বাণু।

আর পেছন ডেকনা। ভারতের সম্রাজ্ঞী হতে চেয়েছিলাম, এবার সম্রাজ্ঞ্য

গড়ব মনুষ্যহীন বনে। সেখানে সুবা বিহীন সুবেদার হবে সম্রাট। গাছের পাতা চামর দোলাবে, ফোঁকর বাঁশ নহবতের তাল শোনাবে, বনবিড়াল লাঙ্গুল তুলে অভিবাদন জানাবে। আমি হব সম্রাজ্ঞী।

হো-হো করে হেসে উঠল পিয়ারা বাণু। এযে পাগলের হাসি। নৈরাশ্য আর অনিশ্চয়তা উন্মাদ করেছে তাকে।

ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল অমিতা। ছুটে এসে বিশাখার হাত চেপে ধরল। বিশাখা অমিতার অবস্থা দেখে চমকে উঠল, কিরে ভয় পেয়েছিস।

না, হাঁ। আর এক মুহূর্তও নয়। এক্ষুনি ফিরে চল বিশা। আর বেশিক্ষণ এখানে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব। তুই ঠিকই বলেছিস, ভূতের দল ইণ্টারভিউ নিতে লাইন বেঁধে দাঁড়াবে। ওঠ, চল।

বিশাখা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ভয় পাসনা। তুই যে পাঁচশত বছর পূর্ব থেকেই পরিক্রমা শুরু করেছিস। পাঁচশত বছর শেষ করে বর্তমানে মনটা ফিরিয়ে নিয়ে আয়। বর্তমানই যে সত্য। অতীত যে অট্টহাস্য করছে, ভবিষ্যতে আরও অন্ধকার। পেছনে তাকাস না, সামনে চোখ দিস না।

অমিতা অপলকে বিশাখার মুখের দিকে চেয়ে ছিল। বিশাখার কথা শেষ হতেই অমিতা বলল, কল্পনা বাস্তবের চেয়েও কত ভয়ঙ্কর তা আজ বুঝলাম।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে গোযানে উঠে বসল দুজন।

সরকার মশায় জিজ্ঞাসা করল, এবার ছোট সোনামসজিদ দেখতে যাবে কি?

অমিতাই বলল, না, গাড়ির মুখ ফিরিয়ে নিল। এবার ঘরে ফিরব।

সরকার প্রতিবাদের সুরে বলল, এত তাড়াতাড়ি কেন মা, আমরা এদেশের লোক, ইচ্ছে হলেই এদিকে আসতে পারি। তুমি কোলকাতা থেকে এসেছ, সব কিছু দেখে যাও'।

না কাকাবাবু, আমার ভয় করছে। এই শ্মশানের সৌন্দর্য সহ্য করতে পারছিনা। আর কিছুক্ষণ থাকলে দম বন্ধ হয়ে মারা যাব।

সরকার মশায় গাড়ি ফেরাতে বলল গাড়োয়ানদের।

গাড়ি ফিরে চলল জোতের পথে।

কাঁচা রাস্তার ধুলো উড়িয়ে গাড়ি চলতে থাকে।

অমিতা বিশাখাকে আঁকড়ে ধরে শুয়ে থাকে ছই-এর তলায়।

অনেক রাতে গাড়ি এসে দাঁড়াল বিশাখার গৃহে।

তারাময়ী অপেক্ষা করে বসেছিল। বিশাখা আসতেই বলল, তোকে রাধানাথ দু-তিনবার খুঁজে গেছে।

কিছু বলে গেছে।

বলেনিতো কিছু। তবে শুনলাম মিশিরের নাকি কলেরা হয়েছে। চিকিৎসার জন্য এসেছিল কিনা কে জানে?

অমিতা জিজ্ঞাসা করল, মিশির কে?

ও শুনে তোর কাজ নেই। চল খেয়ে দেয়ে গড়িয়ে নেই শেষ রাতটুকু।

শেষরাতে রাধানাথ ডেকে তুলল বিশাখাকে। বিশাখা উঠে আসতেই বলল, মিশির মারা গেছে।

বিশাখা নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইল।

তোমাকে যেতে হবে মুখাগ্নি করতে।

না। বলেই বিশাখা শোবার ঘরে প্রবেশ করল। এই উত্তরের জন্য রাধানাথ প্রস্তুত ছিলনা, উত্তর শুনে রাধানাথ লজ্জায় মাটির সাথে যেন মিশিয়ে গেল।

॥ ৪ ॥

পুরাতন শহরে সামান্য একটু নাড়াচাড়া উঠল মিশিরের মৃত্যুতে। তারপর চুপচাপ। বিরাট নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে পুরাতন শহরে। কারও জীবনে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। একমাত্র সৌদামিনী কিছুক্ষণ ডুকরে কেঁদেছিল। পরের দিন সৌদামিনী ব্যস্ত রইল ঘরবাড়ি গোছাতে। আঁতি আঁতি পাতি পাতি করে খুঁজে দেখল মিশিরের কোথায় কি সম্পদ লুকানো আছে। চটের বস্তা বোঝাই দিয়ে দ্রব্যসামগ্রী একধার করে রাখল। শেষরাতে গোরুরগাড়ি ভাড়া করে মিশিরের যা কিছু ছিল সব নিয়ে এসে উঠল কোর্ট ষ্টেশনে। সেখান থেকে সোজা পাড়ি জমালো খেতুরে। মিশিরের থাকবার মত আর কিছু রইল না। তার নামটুকু মানুষের মন থেকে ধীরে ধীরে মুছে গেল।

একটি লোকের মনে মিশিরের কথা মাঝে মাঝে জাগে। সে লোকটি হল নিতাই। অথচ নিতাই এবং মিশিরের বাস্তব জীবন ছিল অদ্ভুত বিপরীতধর্মী। মিশির মরবার কদিন আগেও মিশিরের সাথে নিতাইয়ের কলহ হয়ে গেছে। নিতাই মিশিরকে দুধের জোগান দিয়ে এসেছে। প্রতি বছরই প্রাপ্যগণ্ডা বুঝে নিয়েছে আমের মরশুমে। এবার নিতাইয়ের অগ্রিম টাকা প্রয়োজন হয়েছে পদ্মের তাড়নায়।

নিতাই মিশিরের সামনে হাত জোড় করে নমস্কার জানাবার ভঙ্গী করে বলেছিল, বারভন্‌কে সেওয়া লাগে মিশিরজি। এবার নগদ কড়িটা দাও দিকি।

মিশির তুষ্ণীভাব ধারণ করে বলেছিল, হিসাব করলু ?

হিসাবতো মুখে মুখে। বছরে তিনশ পঁয়ষট্টি দিন, তিনশ পঁয়ষট্টি সের দুধ। নগদ তিনশ' পঁয়ষট্টি আনা। দাও দিকি বাপু।

মিশির মনে মনে হিসাব করতে লাগল, জোগান কামাই কত হয়েছে। হিসাবে কোন ভুল খুঁজে না পেয়ে বলল, লেকিন দুধতো তিন পয়সা করকে বিকাতা হায়।

হ্যায়তো ঠিকই। সে দুধে মা গঙ্গা থাকেন তাই দামে ঘাটতি দিলেও দুধে হাত নাই পড়তা হ্যায়।

তু তব সাহুকার? এহিতো বাত ?

সে তুমি জানো। পয়সাটা দাও দিকি। গিন্নী তারকেশ্বরে হত্যে দিতে যাবে, পয়সার বড় দরকার।

ওঃ তিরোথমে যাইবু। আচ্ছা এক হপ্তা বাদ মিলবে।

অতোদিন দেরী করতে পারব না বাপু। কালই চাই।

এহিতো, দেনেওলা দেগা তব্‌তো।

নিতাইয়ের ইচ্ছা হচ্ছিল কটা কঠিন কথা শুনিয়ে দেয়। কিন্তু তার আগেই রণক্ষেত্রে সৌদামিনীকে দেখা গেল। সৌদামিনী আঁটসাঁট মেয়ে, দেখতে সুরূপা বলাও যায়। মিশিরের গৃহক্ষেত্রে সেই সর্বেসর্বা। রণক্ষেত্রে এসেই বলল, তোমার হিসাব ঠিক আছে গয়লারপো, এই নাও টাকা।

সৌদামিনী আঁচল থেকে পাঁচ টাকার একখানা নোট খুলে নিতাইয়ের হাতে দিল। নিতাইও ট্যাঁক থেকে খুচরো পয়সা বের করে সৌদামিনীর হাতে তুলে দিয়ে ফিরে এল।

বিকেল বেলায় সৌদামিনী সোজা এসেছিল নিতাইয়ের বাড়িতে। পদ্ম সৌদামিনীকে দেখে হাসতে হাসতে বলেছিল, কে গো, মিশিরের বউ !

সৌদামিনী হাসতে হাসতে বারান্দায় উঠে এসে পা ঝুলিয়ে বসেছিল।

বলেছিল, তুই নাকি তারকেশ্বর যাবি পদ্ম ?

হাঁ গো হাঁ।

ছেলে পাবার হত্যে দিবি ?

পদ্ম গয়লানীর রাঙা মুখ আরও রাঙা হয়ে উঠল। সৌদামিনী হাসতে হাসতে বলল, লজ্জা পাচ্ছিস কেন। বাবার দয়া হলে তাও হতে পারে। আমিও তোদের সাথে যাবো রে পদ্ম।

তুমি যাবে কোন দুঃখে।

দুঃখের জন্যই বুঝি বাবার মন্দির যায়। সুখ সইতে না পারলেও যায়। আমার সুখ সইছেনা পদ্ম সই। তোর সাথে আমিও যাব।

সঙ্গী পাবার সম্ভবনায় পদ্ম রাজি হয়ে গেল। কিন্তু রওনা হবার এগারদিন আগে মিশির বিনা নোটিশে পাড়ি জমালো। সৌদামিনীও সংসার গুছিয়ে বেরিয়ে

পড়ল খেতুরের পথে। যাবার আগে পদ্মের সাথে দেখা করে বলে গিয়েছিল, খেতুর গিয়ে মায়ের কাছে সব কিছু জমা রেখে তারকেশ্বরে তোর সাথে দেখা করব, বুঝলি।

পদ্ম কোন কথা বলেনি। রাতের বেলায় নিতাই ফিরে আসলে সৌদামিনীর কথা বলল। সৌদামিনী তারকেশ্বরে দেখা করবার কথা বললেও নিতাই বিশ্বাস করেনি। সে বলেছিল, ওসব বোরেগী বষ্টুমীদের কথা বাদ দাও। আবার হয়ত নতুন নায়ে উঠে বসবে।

নিতাই মিশিরের জন্য মাঝে মাঝে দুঃখ করত। লোকটার যতই বদ্‌গুণ থাকুক লোকটা মিশুকে ছিল। সারা শহরে এমন লোক ছিল না যে তাকে চিনতো না, এমন কি থানায় নতুন সেপাই বদলি হয়ে আসলে মিশির প্রথম দিন এক লোটা ভাঙের সরবত নিয়ে তার সাথে আলাপ জমিয়ে আসতো। নিতাই লক্ষ্য করেছে, মিশিরের জন্য রামতিরিক্কে একবার হা-হুতাশও করল না। অথচ মিশির যেখানেই থাকুক রামতিরোখিয়ার শুকনো প্রসাদ পেতে সন্ধ্যা বেলাটিতে ধূমকেতুর মত হাজির হত।

গাজনের আগেই নিতাই আর পদ্ম এসে পৌঁছালো তারকেশ্বরে।

তারকেশ্বরের লোকসংখ্যা দেখে পদ্মতো থ'হয়ে গেল। লোকে লোকারণ্য। এত মানুষ কখনও দেখেনি তারা। ধূলিয়ান থেকে সোজা এসেছে শেওড়াফুলি, সেখান থেকে তারকেশ্বর। পথে নানা মানুষ, নানা কথা, নানা ভঙ্গী দেখেছে কিন্তু একটিমাত্র স্থানে এত মানুষ, এত কথা, এত ভঙ্গীর সমাবেশ হতে পারে তা পদ্ম অথবা নিতাই কল্পনা করতে পারেনি।

পদ্ম ফিস্ ফিস্ করে বলেছিল, সদুকে একটু খুঁজো।

নিতাই কোন জবাব না দিয়ে বাসার খোঁজে বের হল। পদ্ম হত্যা দেবে, কতদিন দেরী হবে কে জানে। পাশের মাঠে দরমা ঘেরা কতকগুলো ঝুপড়ি তৈরী হয়েছে যাত্রীদের জন্য, সেখানে বহু কষ্টে স্থান জুটলো।

পদ্ম দুধ পুকুরে স্নান করে ভেজা কাপড়ে হত্যা দিচ্ছে মন্দিরে। সকালে বিকেলে নিতাই তার খাবার নিয়ে আসে। পদ্মের খবরাখবর নেয়। দুতিন দিন পরে বিকেল বেলায় পদ্মের খবর নিতে এসে দেখল, সৌদামিনী পদ্মের পাশে চুপ করে বসে আছে। সৌদামিনী যে আসবে একথা নিতাই ভাবতে পারেনি।

সৌদামিনীকে দেখে অবাক হয়ে গেল। বলল, কি বষ্টুমীদিদি কবে এলে?

আজই এসেছি গয়লারপো। এসেই পদ্মের সাথে দেখা হয়ে গেছে। যাক ভালই হল।

আছ কোথায়?

বাবার মন্দির বিনা আমাদের স্থান কোথায়?

পদ্মের কাছ থেকে উঠে আসতেই সৌদামিনী বলল, দাঁড়াও গয়লারপো তোমার বাসাটা দেখে আসবো, বিদেশ বিভূঁইয়ে কখন কাকে দরকার হবে কে বলতে পারে।

সৌদামিনীর যুক্তি ও আন্তরিকতার মধ্যে কোনই কপটতা ছিল না। পদ্ম সৌদামিনীর কথা সহজভাবে মেনে নিয়ে নিতাইকে তাদের বাসস্থান দেখিয়ে দিতে বলল।

সারাটা রাস্তা নিতাই সৌদামিনীর সাথে কোন কথা না বলে সোজা এসে হাজির হল তার ঝুপড়িতে। সৌদামিনীকে মাদুর পেতে বসতে দিল।

তা বেশ জায়গা পেয়েছ তুমি। দেখা থাকল, দরকারে অদরকারে আসতে পারব। এবার চলি। আবার মানসিক পূজা আছে, মিশিরের পিণ্ডিটা দিয়ে নেব। বার বছর ঘর করেছি, মায়াটাতো কম নয়। আঠার আর বার কত হয় গয়লারপো! এককুড়ি দশ বছর? ধরো এতোটা বয়স হল, কাঁদলাম শুধু মিশিরের জন্য। শেষকালে তার পিণ্ডি দেবার যখন কেউ নেই, আমি যদি না দেই অধম্ম হবে।

নিতাই শুধু মাথা নাড়ল।

সৌদামিনী আবার পরে আসব বলে উঠেই রওনা দিল।

পরের দিন পদ্মকে খাবার দিয়ে এসে নিতাই সবে থালায় ভাত বেড়ে নিয়েছে এমন সময় সৌদামিনী এসে ঝাঁপ ঠেলে ভেতরে ঢুকল।

খেতে বসেছ গয়লা ঠাকুরপো? কি রেঁধেছ? ওমা, শুধু ভাতেভাত আর ডাল সেদ্ধ।

নিতাই সৌদামিনীর সম্বোধনটা লক্ষ্য করে আর মুখ তুলতে পারেনি। তার ওপর ডাল সেদ্ধ ভাতের ওপর নজর দেওয়াতে নিতাই কেমন অপ্রস্তুত হয়ে গেল, মৃদুকণ্ঠে বলল, একা মানুষ, আর কি রাঁধব বষ্টুমীদিদি। দিন কাটানো দরকার তাই কাটাচ্ছি।

সৌদামিনী অভ্যর্থনার অপেক্ষা না করে নিজেই মাদুর পেতে বসল। নিতাইয়ের সাথে নানা ধরণের অপ্রয়োজনীয় গালগল্প শুরু করে দিল। নিতাই বুঝল, সৌদামিনীর উদ্দেশ্য খুব মহৎ নয়। কিছু বাগাবার তালে সে ঘুরছে। সৌদামিনী যখন বিদায় নিল তখন দুপুর পেরিয়ে গেছে। নিতাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

বিকালবেলায় নিতাই মনে করেছিল কথাটা পদ্মকে বলবে কিন্তু সৌদামিনী সেখানে উপস্থিত থাকায় বলা হয়নি।

এরপর থেকে প্রতিদিন দুপুরবেলায় সৌদামিনী হাজিরা দিতে লাগল। সৌদামিনী মাদুর পেতে গা এলিয়ে দিত। নিতাই বাধ্য হয়েই বাইরে বসে থাকত।

এমনি ধারাই বোধহয় দিন কাটত। মন্দিরে তারকেশ্বরের হত্যা দিতে দিতে পদ্মও ক্রমশ কৃশ হতে থাকে। দেহের বল তার কমতে থাকে. কিন্তু বাবার আশীর্ব্বাদ না নিয়ে সে ফিরবে না বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নিতাই তাকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছে। আর দুদিন, আর দুদিন করতে করতে অনেক দিন পেরিয়ে গেছে। তবুও পদ্মকে রাজি করাতে পারেনি।

সেদিনও দুপুরে এসে সৌদামিনী মাদুরে গা এলিয়ে দিয়েছিল। ইচ্ছাকে দমন করে নিতাই কটুকথা বলতে গিয়ে থেমে গেল। রোজ যে লোকটি অনাহুত ভা .বে আসে তার সম্বন্ধে তার মনোভাব সুস্থ নয়, তবুও মানা করতে পারত না। কোন কোন দিন সন্ধ্যার সময় সৌদামিনী ফিরে গেছে মন্দিরে। পদ্মকে সৌদামিনীর কথা বললেও সে শুনতে চায়নি। পদ্মের যুক্তি, দেশের লোক আসবে বইকি!

সেদিন বিকেলের আকাশে মেঘ জমতে থাকে। পদ্মের খবরাখবর করে ফিরে আসতে না আসতে ঝড় উঠল। নিতাই দৌড়ে ঝাঁপ খুলে ঢুকল তার ঝুপড়িতে। তখনও সৌদামিনী ঘুমোচ্ছে। বাইরে তখন প্রলয় সুরু হয়ে গেছে। ঝড়ের সাথে সাথে প্রবল বর্ষণ হচ্ছে। নিতাই ঝাঁপটি ভেজিয়ে দিয়ে ঝুপড়ির এক কোনায় চুপ করে বসে রইল। দমকা বাতাসে ঝাঁপটা খুলে গিয়ে বৃষ্টির ছাট এসে ঢুকলো ঝুপড়িতে। বাতাসে সৌদামিনীর গায়ের কাপড় এলোমেলো হয়ে যেতেই সৌদামিনীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। সৌদামিনী উঠে বসল।

নিতাই বলল, ঘুম ভাঙ্গলো ! আচ্ছা ঘুম বাপু। বাইরে এই ঝড় বৃষ্টি। তোমার ওসবে ভোরোক্ষেপও নেই।

সৌদামিনী কাপড় সামলাতে সামলাতে বলল, ডাকতে পারতে তো।

আবার একটা দমকা বাতাস ঢুকল ঘরে। নিতাই উঠে গিয়ে ঝাঁপটা ভাল করে বেঁধে দিল। সৌদামিনীও ভালকরে কাপড় জড়িয়ে আঁটসাঁট হয়ে বসল।

নিতাই চুপকরে বসল তার পুরানো জায়গায়। ঝুপড়ির স্তিমিত আলোকে মাঝে মাঝে সৌদামিনীকে দেখছিল।

সৌদামিনীর ঠোঁটে বঙ্কিম হাসি, বলল, চুরি করে কি দেখছ ?

নিতাই লজ্জায় মাথা নীচু করে রইল।

চুরি করতে দোষ নেই, বললেই বুঝি দোষ। মেয়েদের দিকে ওভাবে নজর দিতে নেই ঠাকুরপো। বলেই নির্লজ্জের মতো সৌদামিনী হো-হো করে হেসে উঠল।

নিতাই চমকে উঠে বলল, কি বলছ ?

বলছি, তুমি ধম্মপুত্তুর যুদিস্তির। মেয়েদের মুখ দেখা পা[illegible]। চো[illegible] বুঁজে থাকো ঠাকুরপো। সৌদামিনী আবার খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল।

হাসির ঝাপটা গিয়ে লাগল নিতাইয়ের মুখে চোখে। সন্ধ্যা[illegible] বাহিরে, ঝুপড়ির বদ্ধ ঘরে আরও আঁধার। সৌদামিনীর [illegible] আমি যদি তার চোখে মুখে। কথা বলবার সাহস যেন সে হারিয়ে [illegible]েছিল। [illegible] চুপ করে বসেছিল তেমনিই বসে রইল নিতাই।

বাইরে ঝড় বৃষ্টি কমেছে। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মেঘও ডাকছে গুরু গুরু করে।

সাঁঝ পেরিয়েছে, নিতাই বলল অস্ফুটস্বরে।

আঁধারে বসে ভূত ভূত খেলব নাকি। কুপি লণ্ঠন জ্বালাও।

নিতাই খেয়ালই করেনি। সৌদামিনীর কথায় উঠে দাঁড়িয়ে সতর্কতার সাথে লণ্ঠন দেশলাই খুঁজতে লাগল। ঝুপ[illegible] এত অন্ধকার যে পাশের লোককেও দেখা যাচ্ছিল না। শুধু সৌদামি[illegible] [illegible] [illegible]াড়ির অংশ মাঝে মাঝে চোখে পড়ছিল। বেড়ার সঙ্গে গোঁজা ছি[illegible] টেনে বের করে ঠুকতে ঠুকতে হয়রান হয়ে গেল নিতাই। [illegible] [illegible] [illegible] ভিজে গেছে, কাঠির

পর কাঠি ফুস-ফাস করে জ্বলে সামান্য আগুনের ঝিলিক দেয় আবার নিভে যায়।

সৌদামিনী বলল, বুঝলাম মুরোদ। দাও আমাকে দাও।

নিতাই হাত বাড়িয়ে সৌদামিনীকে দেশলাই দিতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। এই পতন যে তার জীবনের সমস্যাময় পতন নিতাই তা যদি জানত তাহলে সেই মুহূর্ত্তে ঝাঁপ খুলে ছুটে বেরিয়ে যেত সেখান থেকে। মানুষের জীবনের এমন কতকগুলো দুর্ব্বল মুহূর্ত্ত আসে, যখন ইচ্ছার সুস্থতা থাকা সত্ত্বেও কার্যকালে অসুস্থ জীবনের পথে পা ফেলতে সে বাধ্য হয়। নিতাইয়েরও তাই হয়েছিল। মনে মনে সৌদামিনী সম্বন্ধে শঙ্কিত হলেও কখনও তাকে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেনি, বরং চুম্বক যেমন সূঁচকে আকর্ষণ করে, ঠিক তেমনি-ই কোন রহস্যজনক আকর্ষণে নিতাই সৌদামিনীর সাথে জড়িয়ে পড়েছিল।

সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে সৌদামিনীকে পাশে শুয়ে থাকতে দেখে নিতাই কেম যেন ভীত হয়ে উঠল। বিগত রাত্রির স্মৃতি যে কি ভয়ঙ্কর মর্ম-পীড়াদায় [illegible] ই প্রকৃত প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠল তার মুখে চোখে। অর্দ্ধবিবস্ত্রা সৌ[illegible] দিকে ফিরে তাকিয়ে কেমন অবসাদ বোধ করতে লাগল সে। মানসিক অবসাদের মধ্যেই সে বুঝতে চেষ্টা করল, পদ্মের অধিকারকে অস্বীকার [illegible] কোন যুক্তিতে সে দেহসর্বস্ব নারীকে শয্যায় স্থান দিয়েছিল। মানসিক অনাহুত ভা [illegible] লাভ পাওয়াতে এই প্রশ্নের কোন জবাব খুঁজে পেলনা। [illegible] একবার মনে করল, সৌদামিনীকে ডেকে তোলে, আবার ভাবল কাজ কি। জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেলে কেমন হয়। কিন্তু মনের দ্বন্দ্বে ক্রমশই তার দেহটা যেন স্থবির হয়ে উঠল। নিতাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে বসে রইল।

সৌদামিনীর যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন অনেক বেলা। উঠে ব[illegible]সই দেখে নিতাই তার পাশে চুপ করে বসে রয়েছে। সৌদামিনী হাঁটুতে ধাক্কা দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কখন উঠেছ?

অনেকক্ষণ।

আমাকে ডাকোনি [illegible]

দেখছিলাম।

সৌদামিনীর ঠোঁটে [illegible] উঠল। বুঝল, পাখি খাঁচায় আ[illegible]ক

হয়েছে, দরজা খোলা পেয়েও পালাতে পারেনি। ডানাভাঙ্গা পাখির সন্ধান সে পেয়েছে।

দায়িত্বপূর্ণ গৃহিণীর মতো গাম্ভীর্য নিয়ে বলল, বাজার করে নিয়ে এস।

অতি মৃদুস্বরে নিতাই বলল, সবই ঘরে আছে।

নিতাই উঠে ধীরে ধীরে ঝুপড়ির ঝাঁপ ফাঁক করে বেরিয়ে গেল। সেখান থেকে সোজা গেল মন্দিরে। মন্দিরের বারান্দায় পদ্ম ধ্যানমগ্ন। পদ্মকে দেখে নিতাইয়ের হাত পা যেন অবশ হয়ে গেল। মনে হল, দৌড়ে পালিয়ে যাবে। কলঙ্ক মাথায় নিয়ে পদ্মের সামনে সে যেতে পারবে না। কিন্তু পা দুটো এমন অবশ হয়ে গেছে যে সে এগোতেও পারছিল না, পিছু হাঁটতেও পারছিল না। নীরবে সে দাঁড়িয়ে রইল।

পদ্ম যখন চোখ মেলে তাকালো তখন সকালের কোন চিহ্নই কোথাও নেই। মন্দিরের ঘড়িতে দশটা বেজে গেছে। নিতাইকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পদ্ম অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, ওখানে রোদে অমনভাবে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

নিতাই কোন উত্তর দিতে না পেরে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। অনভ্যস্ত খুনী আসামীর মত তার চোখ মুখ দিয়ে আতঙ্কের ছবি ভেসে উঠছিল। শুধু মৃদুস্বরে বলল, না, কিছু নয়।

তোমার শরীর ভাল নয়। কষ্ট হচ্ছে। আর তিন দিন অপেক্ষা কর। তিন দিনে যদি কিছু না হয় তাহলে আর এখানে থাকব না।

নিতাই চিন্তিতভাবে বলল, বেশ, তাই ভাল। তোমার খাবার নিয়ে আসছি।

নিতাই বাজার থেকে পদ্মের জন্য ফলমূল কিনে এনে দিয়ে দুধ পুকুরের ধারে গিয়ে বসল। বেলা তখন মাথায়। সোজা ছায়া পড়ছে পায়ের সামনে। বেমনা ভাবেই সে নেমে পড়ল পুকুরে। অনেকক্ষণ ধরে স্নান করে ধীরে ধীরে ভেজা কাপড়েই ফিরে এল তার ঝুপড়িতে। ঝুপড়ির ঝাঁপ ধাক্কা দিয়ে খুলতেই চমকে উঠল। সামনের পুকুর থেকে বোধহয় সৌদামিনী সবে স্নান করে ফিরেছে। ভেজা কাপড় লেপটে রয়েছে তার দেহে। যৌবনের দুরন্ত রেখাগুলো ফুটে উঠেছে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে। সেও কাপড় বদলাচ্ছে।

নিতাইকে ভেজা কাপড়ে ঢুকতে দেখে সৌদামিনী পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে দাঁতে কাপড় চেপে ধরে বলল, একটু বাইরে দাঁড়াও।

নিতাই বাইরে দাঁড়াতে পারল না। ভেজা কাপড়েই ছুটে গেল মাঠের অপর

দিকটায়। থানা পেরিয়ে ডান দিকে ঢালুতে যেখানে রাস্তা নীচে নেমে গেছে সেখানে এসে সে থামল। নিশুতি রাতে ভূত দেখার মত তার অবস্থা। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রোদে তার ভেজা কাপড় শুকিয়ে গেছে। ক্ষিদেয় পেট মোচড়াচ্ছে, তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে গেছে। একটা পত্রহীন ছোট বটগাছের তলায় চুপ করে বসে রইল নিতাই।

বেলা যখন গড়িয়ে এসেছে তখন ধীরে ধীরে উঠে গেল বাজারে। পদ্মের জন্য সামান্য কিছু ফলমূল কিনে নিয়ে এল মন্দিরে। সেগুলো পদ্মের সামনে রেখে বলল, তুমি আজই চলো।

আর তিনটে দিন। মিনতির সুরে আবেদন জানাল পদ্ম।

তিন দিন! নিতাই কি যেন গুণতে লাগল। বলল, বেশ।

চুপি চুপি ঝুপড়িতে ফিরে ঝাঁপ খুলে ভেতরে ঢুকে দেখল, সৌদামিনী নেই। তাড়াতাড়ি আসন টেনে নিয়ে বসে পড়ল ভাতের হাড়ির সামনে। হাড়ি থেকে ভাত নিয়ে গোগ্রাসে খেতে লাগল।

খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াতেই ঝুপড়ির দরজায় দেখতে পেল সৌদামিনীকে।

অশরীরী প্রেত দর্শনেও যে এতটা নিতাই আতঙ্কিত হত না, তার মুখ দেখে সৌদামিনী বুঝল। নিতাইয়ের মানসিক প্রতিক্রিয়া যাতে স্থায়িত্ব লাভ না করে অথচ সহজ সরল হয় সেদিকেই নজর দেওয়া সৌদামিনীর কাজ। তাই সহজ গলায় জিজ্ঞাসা করল, কোথায় গিয়েছিলে?

নিতাই উত্তর না দিয়ে হাত মুছতে মুছতে মাদুরে এসে বসল।

প্রথম প্রথম অমন হয়।

নিতাই চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করল, কিসের?

সৌদামিনী বলল, ভালবাসার। ও একটা ব্যারাম। আমারও অমন হয়েছিল! মিশির মরতেই ভেবেছিলাম, কি করে থাকব। একজনকে বাদ দিয়ে আরেকজনকে নিয়ে ঘর বাঁধাইতো দুনিয়ার নিয়ম। তাই প্রথম প্রথম মন খারাপ হত। এখন আর হয় না!

নিতাই চিৎকার করে উঠল, কি বলছ সদু?

ঠিক বলছি। দু এক দিনেই সয়ে যাবে। অভ্যাস থাকলে বুড়ো গাইকেও কাঁধে তোলা যায়।

সত্যই সয়ে গিয়েছিল। রাতের আঁধার নেমে এলে সৌদামিনীকে কাছে পাবার নেশায় নিতাই ঝিমিয়ে পড়ত। সারাদিন যে বিতৃষ্ণা নিতাইকে পাগলের মতো ছুটিয়ে নিয়ে চলত, সেই বিতৃষ্ণা নেশায় রূপান্তরিত হত রাত্রি বৃদ্ধির সাথে সাথে। আলো আঁধারের এই খেলায় নিতাই পরাজিত হল।

যেদিন সৌদামিনী খবর নিয়ে এল, আগামী কাল পদ্ম ফিরে আসবে তার ঘরে, সেদিন নিতাই চিন্তিত হয়ে উঠল। তার সাথে সৌদামিনীর সম্পর্ক পদ্ম জানতে পারলে গলায় দড়ি দেওয়া ভিন্ন রাস্তা থাকবে না।

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করল, কি ভাবছ?

পদ্ম আসবে। তারপর?

সৌদামিনী গম্ভীর ভাবে বলল, মেয়ে মানুষ রাখবার ক্ষমতা তোমার নেই। ননীর পুতুলের মতো গলে গেলে দেখছি।

মেয়ে মানুষ! তা বটে।

এবার মেয়ে মানুষের বুদ্ধিটা নাও। শেষ রাতের গাড়িতে চল কোথাও চলে যাই।

কিন্তু পদ্ম?

পদ্মও তার পথ খুঁজে নেবে। বাঁজা মেয়ে মানুষের পথ খুঁজতে কষ্ট হয় না।

পদ্ম সম্বন্ধে এমন অশ্লীল মন্তব্য শুনে নিতাই ব্যথিত হল কিন্তু কিছুই বলবার ক্ষমতা তার ছিল না। নিতাই মাথা নীচু করে বসে রইল।

শেষরাতে সৌদামিনী নিতাইকে ডেকে তুলল। বলল, গুছিয়ে নাও। গাড়ির সময় হয়ে গেছে।

মোহাবিষ্টের মত নিতাই সব গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সৌদামিনীর পিছু পিছু।

পরদিন সকাল বেলায় পদ্ম ফিরে এল মন্দির থেকে নিরাশা নিয়ে। আশা করেছিল, নিতাই আসবে। নিতাইয়ের বিলম্ব দেখে নিজেই এল ঝুপড়িতে। এসেই আবিষ্কার করল, নিতাই নেই। নিতাইয়ের সাথে সাথে সৌদামিনীও নিরুদ্দেশ। পাশের ঝুপড়িতে খবর নিয়ে জানল, ও ঘরের কর্তাগিন্নিকে সকাল থেকে কেউ দেখেনি। বোধ হয় শেষরাতের গাড়িতে ওরা ফিরে গেছে দেশে।

ঝুপড়ির ভেতর প্রবেশ করে বুঝল সামান্যতম জিনিষও নিতাই রেখে

যায়নি। পাণ্ডার কাছে গেল সংবাদ জানতে। পাণ্ডাও কোন সংবাদ দিতে পারল না। পাণ্ডা পাকা লোক। তীর্থ মহিমায় এরকম ঘটনা প্রতি বৎসরই গণ্ডায় গণ্ডায় ঘটে থাকে এবং এই সব ঘটনার পরিণতি সম্বন্ধেও সে নিশ্চিন্ত। একজন অপরজনকে প্রতারিত করতে চাইলেও কর্মকালে দেখা গেছে, পরস্পর নিজস্ব আশ্রয় গড়ে নিয়ে যে যার মত সরে পড়েছে। কেউ আপশোষ করেনি, কেউ কাউকে দোষারোপ করেনি। কে যে প্রতারক আর কে যে প্রতারিত তা স্থির করা সম্ভব হয়নি। প্রথম প্রথম কেউ কাঁদে, কেউ বুক চাপড়ায়, কেউ বা পাগলের মতো ছুটোছুটি করে। তারপর সব চুপচাপ। নিস্তরঙ্গ তাদের জীবন। মিইয়ে যায় তাপ, মনস্তাপ। তারা ফিরে যায় সাবলীল জীবনধারায়, ক্লেদ থাকলেও অনুশোচনা থাকে না।

পদ্ম যখন হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল, পাণ্ডা তখন কোন সান্ত্বনার কথা বলেনি, সে তার অভিজ্ঞতাকে বেশি মূল্যবান মনে করে বলল, এখন কি করবে?

দেশে ফিরে যাব।

তাই ভাল, বলে পাণ্ডা গা ঢাকা দিল।

পদ্ম এসে বসল মন্দিরের সিঁড়িতে। নিতাইয়ের ওপর রাগ করতে পারলনা। নিতাই যখন সৌদামিনীর কথা বলেছে, তখন সে উপেক্ষা করেছে। সে যদি বুঝত সৌদামিনী মিশিরের পরিবার নয় রক্ষিতা মাত্র তাহলে আশঙ্কা থাকতো। মিশির বিহীন সৌদামিনী কাঁদবার মেয়ে নয়, বরং নতুন মিশিরের সন্ধানী সে। নিতাই বুঝতে পেরে তাকে আকুল ভাবে ফিরে পেতে চেয়েছে, বন্ধ্যাত্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার আবেগে সে বাস্তব অবস্থাকে অস্বীকার করেছে। এ ভুল তার নিজের।

পদ্ম চুপ করে বসে রইল। অসাড়ে গাল বেয়ে নামতে থাকে চোখের জল। পদ্ম মনে মনে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করে, এই তোমার মনে ছিল ঠাকুর!

পাষাণ দেবতা মানুষের বুকভাঙ্গা ক্রন্দনে সাড়া দেয়নি কিন্তু পদ্মের মনে আশার কণিকা মূল স্থাপন করেছিল। মন্দিরের সিঁড়িতে বসেই ঠিক করল, একদিন না একদিন নিতাইকে আসতে হবে তার নিজের হাতে সাজানো সংসারে। সেদিন নিতাইকে সে ফিরে পাবেই।

দুপুরের ট্রেনেই পদ্ম বের হল। গন্তব্যস্থল তার নির্দিষ্ট, পথ তার অজানা।

ওদিকেও গাড়ি ছুটছে।

নিতাইয়ের হাত ধরে সৌদামিনী স্থান করে নিয়েছে কাশী যাত্রী গাড়িতে। পাশাপাশি দুজনে বসে, বোধহয় দুজনেই অপেক্ষা করছিল, কে প্রথম কথা বলবে।

সৌদামিনী চুপি চুপি বলল, মন কাঁদছে বুঝি?

সৌদামিনী হাসল, এই হাসিটুকুই তার সম্পদ।

তার কথা কোথায় গিয়ে আঘাত করল তা সৌদামিনী জানতে পারেনি। শাণিত লৌহ শলাকার মত সৌদামিনীর হাসি নিতাইয়ের অস্থি পঞ্জর ভেদ করে হৃদয়ের অতি দুর্ব্বল ক্ষেত্রে আঘাত করল। হৃদয়ের রক্তপাতহীন এই ক্ষতে প্রলেপ দেবার মত যুক্তি সে খুঁজে পেলনা। নিতাই নিজেও জানে না, কি করে পদ্মকে পথে বসিয়ে সে পালিয়ে আসতে পারল। কিসের আকর্ষণে সে সৌদামিনীর পাশে নিজের আসনটুকু করে নিতে সাহস পেল।

নিতাইকে মৌন দেখে সৌদামিনী মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, তুমি কেমন মানুষ বাপু। মেয়ে মানুষের জন্য তোমার বুক ফাটছে। গলায় দড়ি জোটে না।

এই তীক্ষ্ণ বাক্যবান সহ্য করেও নিতাই চুপ করেই বসে রইল।

কথার জবাব দিচ্ছ না কেন?

কি জবাব দেব। মেয়েমানুষের জন্য বুক যদি না ফাটতো তাহলে তোমার সাথে আসতে পারতাম কি!

মৃদুস্বরে সৌদামিনী বলল, পদ্ম ছাড়া চলতে পারনা বুঝি।

চলছি তো।

ওতো রাগের কথা।

বিরাগ না এলে তোমার হাত ধরেই বেড়াতে হবে।

সৌদামিনী পাকা জহুরী। সে জানে নিতাইয়ের নেশা থাকতে থাকতেই ঘর গোছাতে হবে। যেদিন নিতাইয়ের নেশা ছুটবে সেদিন তাকে লোহার বাসরে রাখলেও পালিয়ে যাবে।

গাড়ি ছুটছে।

নিতাইয়ের মন ছুটছে।

ছুইয়ের বেগই দুরন্ত। গাড়ির গন্তব্যস্থল রয়েছে, নিতাইয়ের মনের তা নেই।

নিতাই ডাকল, সদু।

কেন ?

মিশিরের জন্য দুঃখ হয় না।

না। স্পষ্ট সঙ্কোচহীন জবাব।

কেন ?

ও তুমি বুঝবে না। আমি যে পসারী।

নিতাই চুপ করে গেল।

নিতাই ডুবে গেল চিন্তার রাজ্যে। সৌদামিনী হাসলও না, কাঁদলও না, শক্ত হয়ে উঠল তার মুখের পেশী, বয়সের ছাপ ফুটে উঠল চেহারায়। নিতাই একবার মাত্র তার চেহারার দিকে চেয়ে আবার চিন্তার রাজ্যে ডুবে গেল।

মহানন্দা আর কালিন্দী!

নদীর বালুচরে সতর্ক পদক্ষেপে আসছে নিতাই গয়লা। কাঁধে দাদনী দুধের বাঁক। বটতলায় বাঁক নাবিয়ে স্নান সেরে ঘরে ফেরে রোজই। এই সেই নিতাই।

নিজের ছবি নিজেই দেখতে পেল নিতাই। আঁতকে উঠল। সেই দিনের সেই গয়লা নিতাই আর আজকের নিতাই একজন কি ? নিতাই নিজেই ভেবে কুল কিনারা পায় না। কদিন আগেও মনে হয়েছে পদ্মহীন সংসারে সে বাস করতে পারে না। যেখানে পদ্ম অনুপস্থিত সেখানে নিতাই উপস্থিত থাকবে, এ হতেই পারে না। কিন্তু আজ ? নিতাই ভাবতে পারে না। ডাকল, সদু।

কি!

আগামী কাল যদি আমি মরে যাই তাহলে কি করবে ?

সৌদামিনী আশ্চর্য হল না। পসারীর পসরা সাজাবার উপকরণ কমে আসছে, আজকের খদ্দের নিত্যকার খদ্দের না হওয়াই সম্ভব। নিতাইয়ের মনকে যাচাই করা এখনও শেষ হয়নি। তবে অনভ্যাসের দরুণ যে মানসিক অস্থিরতা সে অস্থিরতা জয় করতে হলে যে দুটো অমোঘ ঔষধ প্রয়োজন তার প্রথমটি হল সময়, দ্বিতীয়টি হল সাহচর্য। সৌদামিনী এই দুইটিকে আয়ত্বে আনবার কথাই ভেবেছে। সেদিকে নজর দিতে মোটেই কার্পণ্য করেনি। তবুও নিতাই

যখন প্রশ্ন করল তখন মুখ খুলে বলতে পারল না, তার মনের কথা। সহজ সরল ভাবে বলল, তুমি কেন মরবে। মরণ হবে আমার।

নিতাই যেন সৌদামিনীর কথা শুনতেই পায়নি, আবার নিজের প্রশ্নটি উত্থাপন করে সৌদামিনীর মুখের দিকে এমন ভাবে চেয়ে রইল যাতে মনে হল যে এই প্রশ্নের উত্তর নেবার জন্য নিতাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সৌদামিনী ফিস্ ফিস্ করে বলল, তুমিই বল।

অস্ফুট স্বরে নিতাই বলল, নতুন খদ্দের দেখবে।

সৌদামিনীর ফিস ফিসানি শোনা গেল, তাও হতে পারে।

নিতাই আর কোন প্রশ্ন না করে গাড়ির জানালায় মাথা রেখে ঝিমোতে লাগল। রাত ক্রমশই বেড়ে চলছে। সহযাত্রীদের প্রায় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। প্রথম রাতের উৎকট গরম আর নেই। শেষ রাতের ঠাণ্ডা হাওয়া জুড়িয়ে দিয়েছে সবার দেহ। সৌদামিনী কাঠের দেওয়ালে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। গাড়ি ছুটছে দুরন্ত বেগে।

গাড়ির দুরন্ত বেগ হঠাৎ কমে এল। ঝিমুনি গেল ছুটে। জানালা দিয়ে বাহিরে তাকিয়ে দেখতে থাকে। কোন বড় ষ্টেশনের মতো মনে হল না। অথচ গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। নিতাই ভাল করে চেয়ে দেখল সবাই অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সৌদামিনী তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

মানসিক দ্বন্দ্বে সৌদামিনীর হার হল। পদ্মের হল জয়।

নিতাই চুপি চুপি উঠে এল সৌদামিনীর পাশ থেকে। দরজার কাছে এসে ফিরে তাকাল সৌদামিনীর দিকে। তখনও সৌদামিনী ঘুমোচ্ছে, জেগে উঠবার কোন লক্ষণই বোঝা গেল না। অসম্বৃত হয়েছে সৌদামিনীর গায়ের কাপড়। উঁচু বুকখানা নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে ওঠানামা করছে। নিতাই ভাল করে শেষবারের মত তাকে দেখে নিয়ে দরজা খুলে নেমে পড়ল অন্ধকার ষ্টেশনে। নামবার আগে তার মনে হল, ঘুমন্ত সৌদামিনী যেন মৃতের কাঠামো। নিতাইয়ের মনে হচ্ছিল, সৌদামিনীর এই রূপই আসল রূপ, তার প্রেতাত্মা যেন অট্টহাস্য করছে, ভয়ে আঁতকে উঠল নিতাই। আতঙ্ক নিয়েই সে নেমে পড়েছিল প্লাটফরমে। নামার সাথে সাথেই ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি আবার চলতে আরম্ভ করল। নিমেষে বদলে গেল পটভূমিকা। ঘুমন্ত সৌদামিনীকে নিয়ে গাড়ি চলে গেল দৃষ্টির বাইরে।

অস্বাভাবিক ভাবে সৌদামিনীর হাত ধরে পথে বের হওয়াটা যেমন স্বাভাবিক মনে করেছিল, তাকে ছেড়ে আসাকেও তেমনি স্বাভাবিক মনে করেই নিতাই নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছিল। হয়ত স্বাভাবিকতার গণ্ডীতে বাঁধবার জন্য অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটাতেও সে পারত। হয়ত সৌদামিনীর হাত ধরে কোন অজানা গ্রামে ঘর বাঁধতেও পারত। কেন যে এই কদিনের নাট্যাভিনয় থেকে সে জোর করে ছুটে বের হল তা নিতাই নিজেও বলতে পারবে না। পদ্মের কাছে অবিশ্বাসী প্রমান হওয়ার পর্ব শেষ হয়েছে। পদ্মের সামনে গিয়ে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাইবার পথও বন্ধ। সৌদামিনীর কথা যদি ঠিক হয়, যদি পদ্মও তার মতো নিজের ঘর খুঁজে নেয়, নতুন নায়ে সোয়ারী হয়! উজানে নাও না বেয়ে যদি ভাটিতে নেমে যায়। এসব চিন্তা তার বিবেককে দংশন করেছিল কি না কে বলতে পারে।

মহানন্দা আর কালিন্দী।

সেই নদীর সঙ্গম, সেই কুলু কুলু ধ্বনি, সেই বালুর চর, সেই পুরাতন শহরের ভাঙ্গা বাড়ির স্তুপ, সেই মাটির বাড়ি, সেই গোয়াল, সেই দুধের বাঁক, আরও কত কি! এসব ছেড়ে নিতাই থাকতে বোধহয় পারবেনা।

নিতাই ছুটে যেতে চাইলো তারকেশ্বরে। সেখানে পদ্মের সামনে নতজানু হয়ে স্বীয় কুকর্মের ফিরিস্তি দিয়ে পুরাতন শহরেই সে ফিরে যাবে পদ্মকে নিয়ে।

নিতাই পরবর্তী গাড়ির অপেক্ষা করতে থাকে।

কোথাকার গাড়ি, কোথায় যাবে না জেনেই চেপে বসল গাড়িতে। জংশনে এসে গাড়ি বদল করে আবার রওনা হল।

পথেই মনে মনে ঠিক করে নিল একটা মিথ্যা কাহিনী। পদ্মের সাথে দেখা করে বলবে, সৌদামিনীকে পেঁৗছে দিতে গিয়েছিল। নেহাত দায়ে পড়েই গিয়েছিল।

অদৃষ্ট হাসল।

নিতাইয়ের গাড়ি সেওড়াফুলিতে দাঁড়াল না। পাশের প্লাটফরমে যে গাড়িখানা দাঁড়িয়েছিল সে গাড়িতে ছিল পদ্ম। নিতাই যদি জানত, তাহলে হয়ত ঝাঁপিয়ে পড়ত সেখানে। নিতাইকে টেনে নিয়ে গাড়ি বেরিয়ে গেল। সেওড়াফুলি তার চোখের সামনে ছুটে বেরিয়ে গেল। হাওড়া থেকে ফিরে না আসা ভিন্ন আর পথ রইল না।

অপর গাড়িখানা পদ্ম আর তার সহযাত্রীদের নিয়ে হাওড়ার পথে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল।

হাওড়ায় নেমেই নিতাই তারকেশ্বর যাবার গাড়ি পেল।

তারকেশ্বরে ব্যর্থ অনুসন্ধান করে নিতাই হতাশ হয়ে পড়ল। কেউ বলতে পারল না পদ্মের গন্তব্যস্থল। অনেক কষ্টে পাণ্ডাকে খুঁজে বের করে তার কাছেই শুনল পদ্ম দেশে ফিরে গেছে। নিতাই যেন আশার আলো দেখতে পেল।

নিতাই ছুটে চলল, দেশের পথে। সারাটা রাস্তা কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করতে করতে যখন ধূলিয়ান ঘাটে পৌঁছালো তখন তার পকেট শূণ্য। কয়েক আনা খুচরো তার সম্বল। সামনেই গঙ্গা। গঙ্গা পেরোতে পারলে হেঁটেই সে যাবে তার গৃহে। সারারাত অনিদ্রায় অনাহারে ক্লান্তিতে সে ভেঙ্গে পড়েছে,। ফেরীর বজরায় বসে বসে ঝিমোতে থাকে।

ভর দুপুরে এসে নামল খেজুরিয়াতে। সেখান থেকেও হাঁটা পথে পঁচিশ মাইল পথ। নদীতে নেমে স্নান করে নিয়ে ভেজা কাপড়ে হাঁটতে লাগল। ঘাটের দোকান থেকে মুড়ি কিনে নিল। আঁজলা ভরে জল খেয়ে নিল। চলতে চলতে সূর্য ডুববার আগেই পৌঁছে গেল যদুপুর। মাথা গুজবার জায়গা খুঁজতে খুঁজতে সামনেই পেল পাঠশালার ভাঙ্গা আটচালা।

শেষরাতে আবার রওনা হল।

কোতোয়ালীর ঘাটে আসতে আসতেই সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। অন্ধকার জমাট বেঁধে উঠেছে। আমবাগানের মাঝ দিয়ে দোপায়া রাস্তায় চলতে চলতে মাঝে মাঝে হোঁচট খেতে হচ্ছে। শ্যামের মন্দিরে তখন আরতির বাজনা বাজছে। নিতাই এগিয়ে এসে দাঁড়াল ঘাটে। শেষ ফেরী তখন ওপারে।

নিতাই হাঁক ডাক করে ব্যর্থ হয়ে গ্রীষ্মের শুষ্ক প্রায় নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নদীর খরবেগ তখন নেই, এপারের সুলতানী বুরুজে পাহারাও নেই। এপারের ঘাটে জন মানবের চিহ্নও দেখা যায় না, ওপারে রামতিরিক্কের মাচানে তখনও লণ্ঠন জ্বলছে। অন্ধকারে কতকগুলো লোক চলাচল করছে ওপারের বালুচড়ায়, তাদের মনে হচ্ছে প্রেতাত্মা।

নদী পেরিয়ে ভেজা কাপড় গায়ে দিয়েই নিতাই এসে দাঁড়াল নিজের বাড়ির আঙ্গিনায়। ডাকল, পদ্ম।

শুধু প্রতিধ্বনি ভেসে এল।

সন্তর্পনে উঠল বারান্দায়। আবার ডাকল, পদ্ম।

শুধু প্রতিধ্বনি ব্যঙ্গ করল।

যতবারই সে ডাকে ততবারই প্রতিধ্বনির ব্যঙ্গ ভেসে আসে।

নিতাই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

দেহটা তার ঝিম্ ঝিম্ করছে। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে তাকিয়ে রইল দূরের সুউচ্চ অশ্বত্থগাছের শিখরে। ওখানেই বুঝি তার সব প্রশ্নের জবাব লেখা রয়েছে। বসে থাকতে থাকতে নিতাই ঘুমিয়ে পড়েছিল, সকালের রোদ এসে মুখে পড়তেই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সন্তর্পনে ঘরের তালা খুলে ভাল করে তাকিয়ে দেখল, সবই আছে নাই শুধু পদ্ম।

বাক্স, পেঁটরা, বাসন, বিছানা, মাদুর সবই যেন বলে দিচ্ছে পদ্মের অনুপস্থিতি। দু একটা আরসোলা রাজকীয় ভঙ্গীতে চলাফেরা করছে, একপাশে ইদুঁরে মাটি তুলে ছোটখাট পাহাড় সৃষ্টি করেছে। সবাই এককথা জানিয়ে দিচ্ছে, পদ্ম নেই।

পদ্ম নেই।

অভিমান অথবা অভিনয়। পালন অথবা পলায়ন! কোন উত্তর খুজে পেল না নিতাই।

রামতিরিক্কের কাছ থেকে দুটো টাকা নিয়ে নিতাই ছুটল একলাটী, পদ্মের ছোটবোন করবী যেখানে থাকে। সোজা এসে উঠল করবীর বাড়িতে।

নিতাইকে দেখে করবী খুশী হয়েছিল। অনেকদিন পরে ভগ্নীপতিকে পেয়ে পদ্ম সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেই নিতাই বিব্রত এবং বিপদগ্রস্থ হয়ে উঠল। নিতাই শুধু হাঁ হাঁ করে ফিরে আসতে পারলে যেন বাঁচে।

দুপুর বেলায় খাওয়া দাওয়া করেই নিতাই আবার পথ ধরল।

ফিরে এসেও শান্তি নেই।

পাড়া প্রতিবেশী এল।

কুশল জিজ্ঞাসা করল।

পদ্মের সংবাদ জান্‌তে চাইলো।

নিতাই শুধু মিথ্যার ওপর মিথ্যার পাহাড় রচনা করে, সত্য কথা বলতে

পারে না। কিন্তু শিগগীরই সে বুঝতে পারল পদ্মকে বাদ দিয়ে বাস করা যত সহজ পদ্মের সংবাদ গোপন করে বাস করা তত সহজ নয়। নিজেকে এতদিন শুধু অসহায় মনে করেছে, এখন বিপদগ্রস্থ মনে করতে লাগল।

সন্ধ্যাবেলায় নন্দমুদীর দোকানে এসে বসল। টাউনের যাত্রী এখানে এসে বসে। নতুন সংবাদ পাওয়া যায়। অভিনবত্ব হয়ত থাকেনা তবুও সেই সংবাদের সাথে পদ্মের সংবাদ হয়ত ভেসে আসতে পারে।

টাউন থেকে হাটের দোকানদাররা এসে জমায়েত হয়েছে নন্দমুদীর দোকানে। তারাই শুনে এসেছে, যুদ্ধ লেগেছে। কোথায় তা ঠিক করে কেউ বলতে পারল না। তবে বিলেতের যুদ্ধের জন্যই দেশের জিনিষ পত্র মাঙ্গী হয়েছে। চোদ্দআনার ধুতি চোদ্দসিকেয় বিকোচ্ছে। যাদের মজুত মাল আছে তাদেরই পোয়াবারো।

যুদ্ধ। বিলাত। জিনিষের দাম! সবকিছুর ফাঁক দিয়ে পদ্মর মুখখানা নিতাইয়ের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আরও মনে পড়ে মাতৃত্ব লাভের জন্য পদ্মের উৎকট বাসনা।

কদিন পরেই সরকারী গাড়িতে সরকারী লোকজন দেওয়ালে দেওয়ালে রঙ্‌চঙা ছবির কাগজ সেটে দিয়ে গেল। নিতাই দেখল থানার সেপাইদের মতই ছবিগুলোর পোষাক। তার তলায় কি যেন লেখা রয়েছে। পাঠশালার ছেলেদের ডেকে জিজ্ঞাসা করল, কি লেখা আছে?

শিশুরা বানান করে পড়ে বলল, তিনটি কথা।

নিতাই জিজ্ঞাসা করল, কি কি কথা?

ভাল খাবার, ভাল পোষাক, ভাল বেতন।

কি জন্য তা লেখা নেই।

কদিন পরে সরকারী লোকেরা জানিয়ে গেল, যারা যুদ্ধের কাজ নেবে তারাই তিনটি জিনিস পাবে।

লোকের মুখে নিতাইও শুনেছে এই লোভনীয় তিনটি জিনিসের কথা।

নিতাই যেন পথ খুঁজে পেল। বয়সটা একটু বেশী হয়েছে। পঁয়ত্রিশ পেরিয়েছে। তাতেইবা কি। চেষ্টা করতে আপত্তি কিসের।

নিতাই পরদিন সকালেই রওনা হল টাউনে।

নিতাই আর ফিরে আসেনি। টাউন থেকেই সে চলে গেছে তার কর্মস্থানে। তার পেছনে রেখে যায়নি কোন পরিজন যে একবার তার জন্য হা-হুতাশ করে। একক জীবনের ছাপ থাকে না, থাকেওনি কোথাও। মৃত্যুর হাতছানি পেয়ে নিতাই শান্তির আশ্রয় পেতে ছুটে গেছে। যবনিকার অন্তরালে নিতাই বাধ্য হয়ে আত্মগোপন করল।

পদ্ম কিন্তু আশ্রয় পেয়েছে শঙ্কাহীন পরিবেশে।

শেওড়াফুলিতে এসে পদ্ম ধুলিয়ানের গাড়ি মনে করে যে গাড়িতে উঠে বসেছিল তার গন্তব্য স্থান ছিল হাওড়া। পুরুষদের গাড়ির এককোনায় ঘোমটা টেনে বসেছিল। গাড়ি শ্রীরামপুর আসতেই চেকার উঠল গাড়িতে।

পদ্মের উল্টোদিকে দুজন মহিলা বসেছিল। তাদের টিকিট দেখে পদ্মের সামনে হাত বাড়াল।

পদ্মের টিকিট নেই।

চেকার বিরক্ত হয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগল। পদ্ম কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিল না। সামনে যে দুজন বসেছিল তারা জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাবে ?

পদ্মের গলার শব্দ বের হল ফোঁপানিতে। একজন উঠে এসে ঘোমটার ফাঁকে তার মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল। চেনা চেনা মনে হল তাকে।

তুমি, তুমি কি জোতের লোক ?

এবার পদ্ম কথা বলল, না ওপারের।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তুমিতো গয়লা বাড়ির। মাঝে মাঝে শ্যামের পূজা দিতে আসতে। যাবে কোথায় ?

বাড়ি।

বাড়ি যাবে তো এ গাড়িতে কেন ?

এ গাড়ি নয় ! চমকে উঠল পদ্ম।

টিকিট করনি কেন ?

পয়সা নেই।

চেকার এতক্ষণ দাঁড়িয়ে শুনছিল তাদের কথা। বাধা দিয়ে বলল, পয়সা না থাকলে হেঁটে যাও। সামনের ষ্টেশনে নেমে যেও।

মহিলাদের একজন বলল, শুনুন। ওর একখানা হাওড়া অবধি টিকিট কেটে দিন। আমরা পয়সা দিচ্ছি।

পদ্ম মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল, বিশাখাদিদি।

অমিতা টিকিটের দাম মিটিয়ে দিয়ে বলল, তুমি হাওড়া থেকে ধুলিয়ানের গাড়ি পাবে। টিকিট করে দেব, চলে যেও।

বিশাখা ফিস্ ফিস্ করে বলল, তোর অতো দরদ কেন ?

কেমন সুন্দর মুখখানা দেখছিস না।

আমি আগেই দেখেছি, তুই-ই দেখ। পুরুষ হলে কি করতিস বল দেখি।

পুরুষের কথা হতেই অমিতা চমকে উঠল। সলিল আসতে চেয়েও আসেনি, একথা অমিতা ভুলতে পারেনি। ভুলবার মতো কথাও নয়।

হাওড়া পৌঁছাতে পৌঁছাতে বিশাখা পদ্মের কাছ থেকে মোটামুটি ঘটনা গুলো শুনে নিয়ে বলল, ফিরে গিয়ে কি হবে পদ্ম। তার চেয়ে আমার সঙ্গেই থেকে যাও। আমিও একা, তুমিও একা। দুজনে ভালই থাকতে পারব।

পদ্ম ক্ষীণ প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, কিন্তু ওর সাথে দেখা হবে না যে।

ঘর পাহারা দিলেই দেখা হবে একথা তোমাকে কে বলল! আমি খবর নিয়ে দেখব, যদি নিতাইকে খুঁজে পাওয়া যায়, ধরে নিয়ে আসব। অসহায় ভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়ালে কোন লাভই হবে না। আমাদের দেশের মেয়েরা একেই অসহায় তার ওপর তোমার মত গ্রাম্য মেয়ে আরও বেশি অসহায়। বিপদ পদে পদে। অঘটন ঘটাও সম্ভব।

পদ্ম মৌন সম্মতি জানালো।

কোলকাতা এসে বিশাখা উঠল অমিতার বাড়িতে। পদ্মও সাথে এল।

বিশাখা দুপুরে বেরিয়েছিল কাজকর্মের সংবাদ সংগ্রহ করতে।

মেডিক্যাল স্কুলে গিয়েই শুনতে পেল কতকগুলি মাতৃমঙ্গলের জন্য ডাক্তার চেয়ে পাঠিয়েছে আসাম, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির চা-বণিক সমিতি। উপযুক্ত লোক পাওয়া যাচ্ছে না। যদি বিশাখা যেতে চায় তাহলে এক্ষুনি ব্যবস্থা করা সম্ভব।

আগামী কাল মতামত জানাবে বলে বিশাখা ফিরে এল অমিতার বাড়িতে।

দোতলায় উঠতেই সিঁড়ির তলায় পদ্মকে ঘুমোতে দেখে তাকে আর ডাকল না। সোজা উঠে গেল অমিতার ঘরে।

অমিতাকে দেখেই বিশাখা চমকে উঠল।

তুই কাঁদছিস ?

অমিতা কোন উত্তর না দিয়ে শক্ত হয়ে বসে রইল খাটের ওপর।

পোষ্ট মর্টমের সময় তো কাঁদিস নি।

অমিতা মাথা নাড়ল।

সাধে কি বলে মেয়ের মন। সলিল বুঝি দেখা করেনি। খবর পাঠিয়েছিলি।

হাঁ। সে দেশে চলে গেছে। তার বাবার নাকি অসুখ, টেলিগ্রাম পেয়ে সে রওনা হয়ে গেছে, আমাদের সাথে যেদিন দেখা করবার কথা সে দিন-ই।

তাতে কাঁদবার কি আছে ?

কিন্তু আজ ছাব্বিশ দিনেও সে ফেরেনি।

বোধহয় অসুখ বেশি।

আমাকে লিখে যেতেও তো পারতো। ওখান থেকেও খবর পাঠাতে পারত। কিছুই তো করেনি। কোন দুঃসংবাদ নেই তো !

প্রিয়জন সম্বন্ধে সব সময়ই মনে অমঙ্গল আশঙ্কা জাগে।

অমিতা উত্তর দিল না। সত্য কিন্তু বিশাখা নিশ্চিন্ত হতে পারল না। তখুনি কাপড় জামা না বদলে নীচে নেমে পদ্মকে ডেকে তুলল। বলল, ওপর গিয়ে তাড়াতাড়ি আমার একখানা শাড়ি পরে এসো, বেড়াতে যাব।

পদ্ম কেমন হক চকিয়ে গেল।

দাঁড়িয়ে রইলে কেন, যাও।

পদ্মকে নিয়ে বিশাখা রাস্তায় এসে ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে সোজা গিয়ে উঠল সলিলের শ্যামবাজারের বাসায়। তিন তলার দরজাতে সলিলের ছোকরা চাকর বসে ছিল।

জিজ্ঞাসা করল, নিমু নাকি, তোর বাবু কোথায় ?

বাবু দেশে গেছে।

কবে আসবে ?

আজ তো আসবার কথা।

বাবুর সাথে তুমি দেশে যাওনি ?

প্রশ্নগুলো মধুর হলেও, চাকরটা কেমন ঘাবড়ে গেল।

বিশাখার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নিমু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বিশাখা বহুবার এই বাড়িতে এসেছে, সেজন্য তার কাছে বিশাখা মোটেই অপরিচিত নয়। নিজের মনে বলল, আপনারা বসবেন।

বিশাখা কি ভেবে বলল, না। চলো পদ্ম।

বিশাখা পদ্মকে নিয়ে নীচের উঠোনে পা দিতেই লক্ষ্য করল, দরজার সামনে একখানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়েছে আর ট্যাক্সি থেকে লটবহর নিয়ে নামছে সলিল। সলিল তাকে দেখতে পায়নি। বিশাখা এগিয়ে এসে সদর দরজায় দাঁড়াতেই অন্যমনস্ক সলিল ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। অল্পক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে সলিল বলল, এই যে ডাক্তার চৌধুরী, কখন এলেন ?

এই মাত্র আমি এসেছি। আপনার বাবা ভাল আছেন ?

তা আছেন। মন্দ নয়।

সলিলের বেশ ভূষার দিকে লক্ষ্য করে বিশাখা মুচকি হেসে বলল, একেবারে জামাইবাবু সেজে এলেন দেখছি। কোথায় গিয়েছিলেন।

সলিল কোন কথার উত্তর দিতে না পেরে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

বিশাখা বলল, আমি ডাক্তার। ডাক্তারেরা মানুষের মনের কথা বলতে পারে জানেন তো। অতো ঘাবড়ে গেলেন কেন ?

অভদ্রের মতো সলিল বলল, শরীরটা ভাল লাগছে না, আজকে আসুন। আমি একটু বিশ্রাম করব। অন্যদিন আসবেন।

কেউ যদি বিশাখাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিত তা হলে সে এত অপমানিত হত না। বহুদিনের পরিচিত শিক্ষিত ভদ্র মর্যাদাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি যে এরূপ ব্যবহার করতে পারে তা বিশাখা ভাবতেও পারেনি। এক মাস আগে অমিতার সাথে সে এসেছিল সলিলকে তার প্রোপোজাল স্মরণ করিয়ে দিতে। সেদিন আপ্যায়ণের কোন অভাব ছিলই না, উপরন্তু আধিক্য ছিল। সেই সলিল যে এমন ভাবে কথা বলতে পারে, এ যেন কল্পনাতীত।

বিশাখা হতজ্ঞানের মত পদ্মের হাত ধরে রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

ফিরে এসে অমিতাকে সে কিছু বলেনি, সারারাত ভেবেছে, উত্তর খুঁজে পায়নি, সন্দেহ তার মনে দানা বেঁধে বসেছে মাত্র।

পরদিন দশটা বাজতেই তাড়া দিয়ে অমিতাকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেল মেডিক্যাল স্কুলে। চা বাগানের মাতৃমঙ্গলের চাকরি স্বীকার করে নিল। অমিতাকেও জোর করে বলল, তুইও চাকরি নে।

অমিতা বলল, চাকরির আমার দরকার নেই, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করব।

যখন করবি, তখন করবি, এখন চাকরি স্বীকার করে নে। দরকার হলে ছেড়ে দিতে পারবি। চাকরির মাঝ দিয়ে প্র্যাকটিক্যাল জ্ঞানবৃদ্ধি হবে।

একবার জিজ্ঞেস না করে।

কাকে জিজ্ঞেস করবি, সলিলকে ? আর দরকার নেই। সলিল অনেক দূরে চলে গেছে। সলিল বিন্দু ছিল, নদীতে পৌঁছে বিরাট হয়েছে, সে এখন সমুদ্রে পৌঁছবার অপেক্ষা করছে। অমিতারূপী খড়কুটো ভেসে গেছে অজ্ঞাত দেশে।

মানে ?

মানে নেই। তোর নাটকের নায়ক আর সলিল নয়। অমিতার জীবন নাট্যে সলিল এখন মৃতসৈনিক মাত্র।

বুঝলাম না, বলে বিস্মিত ভাবে অমিতা মুখ উঁচু করল।

বুঝতে হবে না। তুই চাকরি স্বীকার করে নে, বাড়ি গিয়ে বুঝিয়ে বলব।

দ্বিধাপূর্ণ মন নিয়েও অমিতা চাকরি করতে রাজি হল, কেন না পাওয়া থেকে হারানো সহজ।

বাড়িতে এসে অমিতা বলল, তুই সব খুলে বল বিশা, আমার ভীষণ ভয় করছে। কোথাও কিছু বিভ্রাট ঘটে গেছে নিশ্চয়ই, তুই তা বলছিস না।

গম্ভীরভাবে বিশাখা বলল, কাল সলিলের বাসায় গিয়েছিলাম।

আমাকে নিয়ে যাসনি কেন ?

দরকার হয়নি। সলিল বাসায় ছিল না। ফেরবার সময় তার সাথে দেখা হয়েছিল।

তারপর ?

তারপর আর কি, কুশল জিজ্ঞাসা, যা সবাই করে। তার বেশভূষার পারিপাট্য দেখে হেসে জিজ্ঞেস করলাম, জামাইবাবু সেজে কোথায় গিয়েছিলেন ? তার উত্তরে সে আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে।

আঁ! বলিস কি!

তাইতো মনে হচ্ছে, সলিল অনেক দূরে। তোর মত অমিতা চক্রবর্তীর

সাথে সলিল ঘোষ ঘর বেঁধে জাত দিতে পারেনি। পিতার সুপুত্র হয়ে বাড়ি, গাড়ি, শাড়ি ও নারীর ব্যবস্থা করে ফিরে এসেছে। এই আমার বিশ্বাস।

মৃতের মুখের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল অমিতার মুখখানা। বিশাখা সেদিকে লক্ষ্য করেই বলল, তাইতো তোকে চাকরি নিতে বলছিলাম। পৃথিবীটা কল্পনা নয়। তোর কথায় টাকাই হল পৃথিবী। সেই টাকার মোহ শুধু তোরই নেই, রয়েছে সলিলেরও।

অমিতা নীরবে গা এলিয়ে দিল বিছানায়।

অমিতা কাঁদল না। শক্ত পাথরের মতো হয়ে উঠল তার দেহের প্রতিটি পেশী। মনের সাথে সহযোগিতা করেই যেন পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠেছে।

বিকেলের ডাকে অমিতা চিঠি পেয়েছে।

বিশাখা তখন নীচের ঘরে বসে পদ্মের সাথে গল্প করছিল। আসামের চা বাগানের মাতৃমঙ্গলে তারা গিয়ে কি করবে তার তালিকা তৈরী করছিল। এমন সময় ধীর পদক্ষেপে অমিতা এসে দাঁড়াল তাদের সামনে। বিশাখার হাতে তুলে দিল সুদীর্ঘ চিঠিখানা। বিশাখা চিঠিতে চোখ বুলিয়ে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল।

অমি।

আমি মনকে প্রস্তুত করে নিয়েছি বি।

এটাই আমি আশা করছিলাম।

কালকেই আমরা রওনা হতে চাই। কোলকাতার এই আবহাওয়া থেকে মুক্তি চাই। আমাকে নিয়ে চল বি।

বিশাখা হাসল।

চিঠিখানা ভাল করে পড়েছিস। পড়ে দেখ নীচের কটা ছত্র। মানুষ নিষ্ঠুর, স্বার্থসর্ব্বস্ব হলে কি করে অপরকে বঞ্চনা করে তাই পাবি ওতে।

বিশাখা চিঠিখানা খুলে নীচের ছত্র কয়টির দিকে চোখ রেখে বলল, সলিল ঠিকই বলেছে, যাকে সে ভালবাসে তাকে বিয়ে করে ভালবাসার অমর্যাদা করতে সে পারেনি।

তাই ভালবাসাবিহীন বিয়ের চাকচিক্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে অপরের ভালবাসার প্রতি সম্মান দেখিয়েছে।

বিশাখার ঠোঁটে ফুটে উঠল করুণা ও ঘৃণা মিশ্রিত হাসি।

॥ ৫ ॥

বেলা একটা না বাজতেই বিশাখা, অমিতা ও পদ্ম এসে হাজির হল শেয়ালদহ স্টেশনে। আসাম মেলের মেয়েদের ইণ্টার ক্লাশ গাড়িতে জায়গা করে উঠে বসল।

রওনা হবার পূর্ব পর্যন্ত অমিতা কোন কথা বলেনি। তার মনে যে ঝড় উঠেছে তার একটি ঝাপটাও বাইরে প্রকাশ পায়নি। সকাল থেকে কাপড় জামা, ডাক্তারী ব্যাগ, বিছানাপত্র ঠিক করে নিতে নিতে কয়েকবার মুখ উঁচিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়েছিল, তার দৃষ্টি ছিল উদাস। সে দৃষ্টিতে কোন ব্যথার চিহ্ন ছিল না। আঘাত তার হৃদয়কে যেন নিশ্চল করে দিয়েছে। অথচ অভিব্যক্তি বিহীন বেদনা গুমরে উঠবার পথও পাচ্ছিল না। ঝড়ের পূর্বে যেমন গুমোট ভেতরে ভেতরে অস্থির করে তোলে, প্রতীক্ষিত ঝড় আসা অবধি নিস্তব্ধতা বিরাজ করে, এইরূপ অস্থিরতা ও নিস্তব্ধতার সমাহার ফুটে উঠেছিল অমিতার মুখের চেহারায়।

তার বাবা এসে যখন বলল, অত দূরে চাকরি করবার কোন প্রয়োজন আছে কি? তখন অমিতার উত্তর দেবার মত কোন যুক্তি ছিল না, শুধু পিতাকে সান্ত্বনা দেবার অছিলায় বলল, এওতো অভিজ্ঞতা! যদি ভাল না লাগে চলেই আসব। দাসখত দেওয়াতো নেই।

শুনেছি চা বাগনে ম্যালেরিয়া আর কালাজ্বর ভর্তি।

তার জন্যই তো আমরা যাচ্ছি।

ক্ষুন্নভাবে অমিতার বাবা বলল, সাপের ওঝা সাপের কামড়েই কিন্তু মরে।

তোরঙ্গ সাজাতে সাজাতে অমিতা মুখ তুলে পিতার চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে বলল, জানো বাবা, মানুষকে মরতে দেখে দেখে আমাদের এমন অবস্থা হয়েছে, যাতে মৃত্যুটা মনে হয় ছেলেখেলা। এখুনি একজনকে হাসতে দেখেছি, পরক্ষণেই দেখেছি তার নাড়ীর স্পন্দন বন্ধ হয়ে গেছে। নিয়তিকে রোধ করবার

সামর্থ্য কারুরই নেই। মৃত্যু যদি হয় কোলকাতাতেও হতে পারে। তবে তোমার যদি ইচ্ছা না থাকে তাহলে যাব না।

না, না, তা বলছি না। যাবি নিশ্চয়ই, তবে সাবধানে থাকবি। সলিলটা এলনা, তার সাথে দেখা করে গেলে ভাল হত।

ভাল হত কি মন্দ হত জানি না। তার সাথে দেখা না হয়েই ভাল হয়েছে, দেখা হলে বাগ্‌ড়া আসতো।

মুখস্ত কবিতার মত কথাগুলো বলে অমিতা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মুখ নীচু করল।

তখন থেকে গাড়িতে ওঠা অবধি অমিতা কারুর সাথেই কথা বলেনি। বিশাখার দু একটা প্রশ্নে হুঁ-হাঁ করে গেছে। গুছিয়ে কোন কথাই বলতে পারেনি।

ট্রেনটা প্লাটফরম ছাড়তেই অমিতার চোখে জল দেখা গেল। বিশাখা জিজ্ঞাসা করল, কাঁদছিস কেন অমি ?

কেন, বলে অমিতা চোখ মুছল।

বলল, ঘা খেয়ে খেয়ে তুই শক্ত হয়ে গেছিস বি। আমার এই প্রথম আঘাত। প্রথম প্রেম, প্রথম যৌবনের উন্মেষ আর প্রথম আঘাত মানুষকে বিহ্বল করে তোলে। আমিতো ব্যতিক্রম নই।

আজ তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে, ক মাস আগের অমিতা যেন মরে গেছে। অমিতার জীবন দর্শনের ধারা বদলে গেছে, আজকের অমিতা নিতাই গয়লার পরিবার পদ্মের সাথে একই আসনে বসে আছে। কি বলিস পদ্ম ? তাই না।

পদ্ম কিছুই বোঝেনি। বিশাখার কথায় সায় দিয়ে মাথা নাড়ল।

বিশাখা হাসল। জিজ্ঞাসা করল, সায় দিলি কেন ?

তুমি যে বললে।

কখন বললাম। আমিতো জিজ্ঞেস করলাম।

ওই একই কথা। জিজ্ঞেস করার মানে, ঠিক বলা।

বিশাখা হাসল।

অমিতা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল, তার চোখে হাসি ধরা পড়ল না। বিশাখা জিজ্ঞাসা করল কি ভাবছিস ? পথ চলতে যা পেয়েছিস সেই-টুকুই লাভ।

অমিতা চমকে উঠল, তারই কথা বিশাখা ঘুরিয়ে বলছে।

বিশাখা বলল চমকে উঠিস না। আমরা তিনজন। একজন বিবাহিত হয়েও স্বামীকে দেখেনি কখনও এবং স্বামীর মৃত্যু তার চলবার পথ আরও প্রশস্ত করে দিয়েছে। আরেক জনের ছিল সুখের সংসার। মাতৃত্ব লাভের অদমনীয় আকাঙ্খা তাকে স্বামী থেকে বিচ্যুত করেছে। আর শেষের জন, ঘর চেয়ে পেয়েছে আঘাত। যদিও বিচিত্র তিনজনের জীবনধারা তবুও পরিণতি একই। ঈশ্বরের অভিশাপ কি না কে জানে।

অমিতা ডাকল, বি।

বল।

এমন সমন্বয় কখনও দেখেছিস ?

দেখিনি, শুনেছি। শুনতে শুনতে তন্দ্রা নেমে এসেছিল চোখে তাই তার উপসংহারটুকু জানতে পারিনি। যদি সবটুকু জানতাম তা হলে খুশী মনে বলতে পারতাম, মানুষের জীবনে উপসংহারটুকুই সব। সেটা খুঁজে পাইনি বলেই আমাদের তিনজনকে একটি আরসিতে দেখেও তাদের কথা শুনতে চাইনি শেষ না দেখে।

অমিতা মুখ ঘুরিয়ে বসল।

পদ্মও আঁটসাট হয়ে বসল।

বি!

কেন ?

তুই গল্পটা বল, আমি উপসংহারটুকু বলব।

এযে সারা রাতেও শেষ হবে না।

আমাদের গন্তব্যস্থল পৌছাতে আগামী কাল সন্ধ্যা। ততক্ষণ তোর গল্প শুনব।

গল্প!

তা বটে। যা চোখে দেখেনি, কানে শুনেছি অথবা বইয়ে পড়েছি তাই তো গল্প। নইলে সেটা হত কাহিনী।

সহদেবকে তোমরা চিনতে পারবে না। বাংলার ইতিহাস যারা লিখেছে তারা সহদেবের কথা বলেনি। কেন বলেনি তা বলতে পারে ইতিহাসকারেরা।

শামসুদ্দিন বাংলার সুলতান।

পাণ্ডুয়া তার রাজধানী।

দিল্লির সুলতান ফিরোজশাহের ফৌজ ঘেরাও করল দুর্গ। তার আগেই নতুন দুর্গ একডালাতে শামসুদ্দিম তাঁবু ফেলেছে।

একডালার যুদ্ধে দিল্লির সুলতান পালিয়ে বেঁচেছিল কিন্তু সেদিন এই যুদ্ধ জয়ের গৌরব যে অর্জ্জন করেছিল বুকের রক্ত দিয়ে সে হল সহদেব। সামান্য বাঙ্গালীর ঘরে জন্ম, যাকে ভেতো বাঙ্গালী বলা চলে, সহদেব ছিল তাই।

পাণ্ডুয়ার পথ দিয়ে যখন সহদেব ঘোড়ায় চেপে ঘুরত তখন হারেমের বেগমরাও তাকে গোপনে গবাক্ষ পথে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখত।

সহদেব শুধু বীর ছিল না, সহদেব ছিল সুপুরুষ।

সেদিন শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের দক্ষিণ হস্ত, একলক্ষ পদাতিকের নায়ক ছিল সহদেব। এ হেন ব্যক্তিটি যেমন ছিল অপরের ঈর্ষার পাত্র তেমনি ছিল কামনার পাত্র।

সহদেব নগর পাহারা দিত রাতে।

দুর্গ রক্ষার ব্যবস্থা করত সারা দিনমান। নয়া ফৌজকে তালিম দিত সময় বুঝে।

সহদেবের বিশ্রাম নেই।

সেদিন অনেক রাতে সহদেব একাই বেরিয়েছে। ঘোড়া সঙ্গে নেই। হেঁটেই চলেছে।

পাণ্ডুয়ার ছোট গলি পথে সহদেব বাধা পেল। সামনে এসে দাঁড়াল অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকা এক নারী।

সহদেব জিজ্ঞাসা করল, কি চাই ?

আমার মুনিব বড়ই অসুস্থ, আপনার সাহায্য চাই।

সহদেব বীর, দেশের জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ করে রেখেছে। নারীর আহ্বানে তার মুনিবের অসুস্থতা দেখতে যাবে তাতে আর আশ্চর্য কি !

আহ্বায়িকা পথ দেখিয়ে নিয়ে হাজির করল অন্তঃপুরে।

মহলের পর মহল পেরিয়ে অন্তঃপুরের যে অংশে সে উপস্থিত হল সে অংশ বাহিরের পুরুষ কখনও প্রবেশ করেনি। খাস মীরবহরের অন্তঃপুর।

জিজ্ঞাসা করল, কোথায় নিয়ে চলেছ তুমি ?

সামনের ঘরে যান ওখানে আমার মুনিব শুয়ে আছেন।

সহদেব মনে করেছিল, কোন পুরুষ বোধ হয় অসুস্থ হয়ে তাকে ডেকে পাঠিয়েছে। সামনের ঘরের দরজা ঠেলতেই সে চমকে উঠল।

সুন্দর গালিচা পাতা রয়েছে ঘরে। কুলুঙ্গীতে চেরাগের মালা জ্বালানো রয়েছে। ঘরের মাঝখানে খাট, খাটে শুয়ে রয়েছে সুন্দরী উদ্ভিন্ন যৌবনা নারী।

আপনার দাসী আমাকে ডেকে এনেছে, আপনি নাকি অসুস্থ।

সুন্দরী মাথা নাড়ল।

আপনাকে কি ভাবে সাহায্য করব!

সাহায্য? দরকার নেই। আপনি বসুন। হেকিম ওষুধ দিচ্ছে।

তা হলে আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন কেন?

সুন্দরী বালিশে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল।

সহদেব বোকার মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ভাবল, সুন্দরীর দেহের রোগের চেয়ে মনের রোগ বোধ হয় বেশি। বোধ হয় সুন্দরীর মস্তিষ্কে গোলমাল ঘটেছে।

সহদেব বিস্মিতভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

সুন্দরী ফোঁপানি থামিয়ে উঠে বসল, তার চোখে মুখে উদ্বেগের চিহ্ন। বলল, আপনাকে দেখতে চেয়েছিলাম, তাই ডেকে এনেছি।

সুন্দরীর মুখে সলজ্জ হাসি।

বীর সহদেব শত্রুর সম্মুখীন হতে কখনও ভয় পায়নি। আজ নারীর সম্মুখীন হয়ে ভীত হয়ে পড়ল।

সহদেব ফিরে দাঁড়াল।

আপনি যাচ্ছেন?

হাঁ।

একটু দাঁড়ান। বহুদিন দুর থেকে আপনাকে দেখেছি, আজ সামনা সামনি দাঁড়ান। যাবেন না। আপনাকে দু চোখ ভরে দেখব।

না, বলেই সহদেব মহলের পর মহল পেরিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে রাজপথে এসে দাঁড়াল। সহদেব ভেবেই পেলনা মীরের বাড়ি উন্মাদাগার কিনা।

অন্যমনস্কভাবে সহদেব বাড়ি ফিরে এল। সারাটা রাত এপাশ ওপাশ করে সকাল বেলায় বিছানা থেকে উঠে সোজা এসে দাঁড়াল সুলতানের সামনে।

অতি প্রত্যুষে সহদেবকে আসতে দেখে সুলতান ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, এত সকালে কেন সহদেব ?

হুজুর, এই বান্দা ঘোরতর বিপদের সম্মুখীন, আপনি রক্ষা করুন।

যে ব্যক্তি সুলতানের রাজ্য রক্ষা করে, তাকেই রক্ষা করতে হবে শুনে সুলতান বিস্মিত ও ভীত না হয়ে পারল না। আশঙ্কিত ভাবে জিজ্ঞাসা করল বিপদের কারণ সমূহ।

সহদেব গতরাতের ঘটনা ব্যক্ত করে সুলতানের উপদেশ প্রার্থনা করল।

সুলতান হেসে উঠল, বলল, আস্‌নাই, বুঝলে সহদেব এ হল আস্‌নাই। ভয় পেওনা। মহব্বত হল বল্গাহীন অশ্ব। কোনপথে ছুটবে তার স্থিরতা নেই। আমি ভেবেছিলাম, দুষমন বুঝি তোমার জীবন বিপন্ন করেছে।

সহদেব সুলতানের কথায় আশ্বস্ত হল না। বাড়িতে ফিরে এসে দেখল মীরেরবাড়ির দাসী পত্র নিয়ে অপেক্ষা করছে। লেখিকা গত রাতের সেই সুন্দরী। মীরের কন্যা। প্রোষিতভর্তৃকা নারী সহদেবকে হৃদয়ের আসনে বসিয়েছে, এবার তার প্রার্থনা, সহদেব যেন তাকে আরও একবার দর্শন দান করে।

নাটক বোধহয় এখানে শেষ হত, কেননা সহদেব কোনদিনই ওপথে হাঁটেনি, জ্ঞাতসারে সেই সুন্দরীর সামনে দাঁড়ায়নি। কিন্তু নিয়তি কে রোধ করবে। মাস না পেরোতেই নগররক্ষক সৈন্যাধ্যক্ষ সহদেবের কাছে সংবাদ পৌঁছালো মীর-কন্যা জোবেদা জহর খেয়ে দেহত্যাগ করেছে, তার পারলৌকিক ক্রিয়া-কলাপের জন্য অভিজাতদের কবরখানায় মৃতদেহ আনা হয়েছে।

কয়েকজন অশ্বারূঢ় দেহরক্ষী নিয়ে সহদেব গেল কবরখানায়।

জোবেদার দেহ তখন নামানো হচ্ছে কবরে। সহদেবের আদেশে জোবেদার মুখের ওড়না খুলে দেওয়া হল। জোবেদার মুখের দিকে স্থিরভাবে চেয়ে দেখে সহদেব চমকে উঠল। জোবেদা যেন ঘুমিয়ে আছে। মৃত্যুর কোন চিহ্নই তার চেহারায় ছিল না। মনে হচ্ছে, পরিপূর্ণ শান্তির কোলে গা এলিয়ে দিয়ে জোবেদা ঘুমোচ্ছে।

শব বাহকদের জিজ্ঞাসা করল, হেকিম কি বলেছে ?

হেকিম বলেছে, জোবেদার মৃত্যু ঘটেছে।

সহদেব বিশ্বাস করতে পারল না, বলল, কবর দিও না। আমি হেকিমকে জিজ্ঞেস করে আসছি।

সহদেব ছুটে গেল হেকিমের কাছে। সংবাদ নিয়ে জানল, জোবেদার মৃত্যু ঠিকই হয়েছে। মৃতদেহের কবর দেবার কোন বাধা নেই।

সহদেব কবরখানায় ফিরে যেতে পারল না, সংবাদ পাঠাল কবর দেবার।

তারপর কতদিন পেরিয়ে গেছে সহদেব জোবেদাকে ভুলতে পারেনি। তার সব সময় মনে হয়েছে, সে নিজেই এই মৃত্যুর কারণ। নিজেকে নারী হত্যাকারী মনে করে সহদেব প্রায়শ্চিত্তের পথ খুঁজতে লাগল।

সহদেব প্রায়শ্চিত্তের পথে পা দেবার আগেই তার জীবনে এসে দেখা দিল খাস মুন্সী ইন্দ্রনাথের স্ত্রী। লাস্যময়ী এই নারী সহদেবকে টানতে লাগল ব্যাভিচারের পথে। সহদেব অটল অচল। হারেমের মুসলমান কন্যার পক্ষে সহদেবকে খুঁজে পাওয়া যত কঠিন ছিল, রূপমতার পক্ষে তা ছিল না। সে নিয়মিত আসা যাওয়া করতে লাগল সহদেবের গৃহে। নানা ছলা কলায় সহদেবের সাথে হৃদ্যতা সৃষ্টির চেষ্টা করতে থাকে। সহদেব যেন পাঁকাল মাছ। রূপমতীর ধরা ছোঁয়ার বাইরে। রূপমতীও হাল ছাড়বার মতো মেয়ে নয়।

এই দ্বন্দ্বের হয়ত অবসান ঘটত না।

সুলতানী দরবারের গবাক্ষে বসতেন বেগমের দল। শামসুদ্দিনের নব-পরিণীতা স্ত্রী রোকেয়া বানুও বসত সেখানে। জালের সুক্ষ্ম তন্তুর মাঝ দিয়ে রোকেয়া সহদেবের পৌরুষকে যেন দু চোখ দিয়ে পান করত। সহদেব জানতো না, না জানলেও অলক্ষ্যে তার জীবন কাহিনী অন্ধধারায় লিখিত হল।

সহদেবও মাঝে মাঝে মুখ উঁচু করলেই দেখতে পেত রোকেয়াকে।

এবার যেন সহদেব ভালবাসল রোকেয়াকে। সহদেবের কঠিন হৃদয়ে প্রেমের জোয়ার এল। সহদেব দেওয়ানা হয়ে উঠল। কি ভাবে কি হল কেউ বুঝতে পারল না।

শামসুদ্দিন ঠিকই বলেছিল, মহব্বত বল্গাহীন অশ্ব।

সুলতান গৃহিনীর সাথে গোপন প্রেম আর ঘাতকের শাণিত তরবারিকে আলিঙ্গন একই কথা। সহদেব জানত পরিণাম কিন্তু প্রেম কোন নীতির বাধ্য নয়। তাই সাবধান হবার আগেই ঘটনা প্রকাশ পেল।

একথা জানত শুধু রূপমতী। চতুরা রূপমতী নৈরাশ্যজনিত বেদনাকে

প্রতিশোধের মাধ্যমে শেষ করতে চাইল। গোপন সংবাদ পৌঁছালো শামসুদ্দিনের কানে। শামসুদ্দিন রোকেয়াকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, এ সত্যি?

রোকেয়া সত্য মিথ্যা কিছুই বলতে পারল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বল সত্যি?

রোকেয়া তবুও কথা বলল না।

শামসুদ্দিন কুপিত ভাবে বলল, তোমার রুচিকে প্রশংসা করি, কিন্তু সিংহের বিবরে ফেরুপাল নির্ভয়ে ঘোরাফেরা করবে, এ সত্য আমি স্বীকার করি না।

শামসুদ্দিন যতই বলতে থাকে রোকেয়া ততই যেন পাথরের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সে যদি বলত, না, এ সত্য নয়, তাহলে ইতিহাস হয়ত অন্য ভাবে লেখা হত। রোকেয়া তা পারেনি। সুলতানী আদেশে ইট-পাথরের দেওয়ালে রোকেয়াকে জীবন্ত গেঁথে ফেলা হল। ঘটনাটি ঘটল অতি গোপনে কিন্তু রূপমতীর অজ্ঞাত রইল না।

সংবাদটি পরিবেশন করল রূপমতী সহদেব সকাশে।

সহদেব চমকে উঠল।

রূপমতী হেসে বলল, ঘাট দেখে নাও বাঁধতে হয় বীর। নইলে ঘূর্ণিপাকে পড়তে হয়।

নিভৃত শয়ন কক্ষে সহদেব আজ প্রথম কাঁদল। মায়ের কোল ছাড়া অবধি সহদেব কোনদিন কাঁদেনি। নিরপরাধ নারীর জন্য তার মন ডুকরে উঠল।

রূপমতী এইতো চেয়েছিল।

পরদিন প্রত্যুষে সুলতানী আদেশ জারী হল, পাণ্ডুয়া ছেড়ে সবাইকে গৌড় যেতে হবে। ফিরোজ তুঘলক এসেছে সৈন্য নিয়ে বাংলা দখল করতে।

গৌড়ে এসেই আবার আদেশ জারী হল একডালা দুর্গে যাবার। তিন লক্ষ ফৌজ নিয়ে সহদেব চলল একডালায়।

দিল্লির সুলতান অবরোধ করল দুর্গ। তিনমাস কেটে গেল তবুও অবরোধের শেষ হল না। ফিরোজ বুঝল, রণক্ষেত্রে বাঙ্গালীকে হটানো সহজ নয় তাই চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করল।

ট্রয়ের যুদ্ধে গ্রীকরা কাঠের ঘোড়া রেখে গিয়েছিল। সেই কাঠের ঘোড়াই ট্রয়ের পরাজয় ডেকে এনেছিল কিন্তু ফিরোজের চাতুরী বাংলার পরাজয় ডেকে আনতে পারেনি। ফিরোজ ফৌজ নিয়ে রওনা হল দিল্লির পথে। প্রচার

করে দিল সুলতানী সৈন্যেরা ফিরে যাচ্ছে, বাংলার যুদ্ধ অসম্পূর্ণ রেখে। দুর্গ প্রাচীর থেকে শামসুদ্দিন দেখল আক্রমণকারীরা জঙ্গলের পথে অদৃশ্য হয়েছে।

সুলতান শামসুদ্দিন আদেশ দিল দিল্লির সুলতানের পশ্চাদ্ধাবন করতে।

বাংলার তিনলক্ষ ফৌজ দুর্গ দ্বার খুলে ছুটে বের হল।

ফিরোজ এগোচ্ছে ঠিকই। সৈন্যদলকে তিন ভাগে ভাগ করে জঙ্গলের দুপাশে দু দল ফৌজ লুকিয়ে রেখে ক্ষুদ্র একটি বাহিনী নিয়ে নিজেই এগিয়ে চলছিল দিল্লির পথে।

শামসুদ্দিনের ফৌজ পেছন পেছন তেড়ে আসতেই ফিরোজ ফিরে দাঁড়াল, সেই সাথে সাথেই দুপাশের লুকানো সৈন্য শামসুদ্দিনের বিরাট বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শামসুদ্দিন তিন দিক থেকে আক্রান্ত হল।

অচিরেই শামসুদ্দিন নিজের ভুল বুঝতে পারল। তিন দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ শুধু বিব্রত অথবা বিপদগ্রস্থ হলনা, বুঝল বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার সন্ধিক্ষণ উপস্থিত।

শামসুদ্দিন সহদেবকে ডেকে পাঠাল। জিজ্ঞাসা করল, উপায় ?

সহদেব নির্ভীক ভাবে বলল, আমি শত্রুদের আটক করে রাখছি আপনি পথ করে ফৌজ নিয়ে আবার দুর্গে ফিরে যান।

তারপর ?

তারপর! যতক্ষণ আপনি নিরাপদে দুর্গে পৌঁছে নিশানা না দিচ্ছেন ততক্ষণ একটি শত্রুকেও একডালার দুর্গ কিনারায় পৌঁছাতে দেব না।

শামসুদ্দিন দেড় লক্ষ সৈন্যের মুখ ফিরিয়ে দুর্গের দিকে রওনা হল। বাকী দেড় লক্ষ সৈন্য নিয়ে সহদেব প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করল ফিরোজ তুঘলককে। দিল্লির সুলতানী ফৌজ লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল কিন্তু অতি সামান্য সংখ্যক বাঙ্গালী ফৌজ সেদিন ফিরে এল একডালার দুর্গে। ফিরোজ পালিয়ে বেঁচেছিল কিন্তু বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লক্ষাধিক বাঙ্গালী আর তাদের নেতা সহদেব একডালার মাঠে চির নিদ্রায় বিশ্রাম নিয়েছিল।

শামসুদ্দিনের কাছে জয়ের সংবাদ পৌঁছালো, সেই সাথে পৌঁছাল এই জয়লাভের জন্য অমূল্য লক্ষ জীবন বলির সংবাদ। মৃতদেহের স্তুপ থেকে সহদেবের মৃতদেহ খুঁজে বের করা হল। রোকেয়া বাসুকে যে ইট পাথরের

দেওয়ালে গেঁথে মারা হয়েছিল তারই তলায় সহদেবের চিতা সাজানো হল।

আজও বেগমকা জান্‌জা বলা হয় সেই ভাঙ্গা দেওয়ালের টুকরোকে।

একটি পুরুষ, তার তিনটি প্রণয়িনী। এমন সুন্দর নাটকের এমন ভয়ঙ্কর পরিণতি! মৃত্যু যেখানে সমাধান, সেখানে প্রেম-প্রণয় মূল্যহীন।

বিশাখা থামল।

অমিতা অবাক হয়ে বিশাখার কথা শুনছিল। গল্প শেষ হবার সাথে সাথেই বলল, রূপকথাকেও হার মানালি দেখছি।

বিশাখা হাসল।

পদ্ম বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে থাকতে থাকতে কেঁদে ফেলল।

কাঁদছিস কেন পদ্ম! সহদেবকে পছন্দ হয়েছে বুঝি?

পদ্ম চোখ মুছে বলল, বিশাখাদি, তোমরা এসব কোথায় শিখলে?

পড়তে হয়, নইলে জানব কি করে।

গাড়ি এসে দাঁড়াল সান্তাহারে।

অমিতা বলল, এখানেই গাড়ি বদল করতে হবে বুঝি?

এখানেও করলে হয়, পার্বতীপুরে করলেও হয়। এখান থেকে সোজা পথে পাওয়া যাবে আর গাড়ি বদল করতে হবেনা। পার্বতীপুর দিয়ে গেলে আবার লালমনির হাটে গাড়ি বদল করতে হবে। তারপরেও রয়েছে রাজা-ভাতখাওয়া। সেখানে আবার গাড়ি বদল।

জয়ন্তীতে সবাই যখন পৌঁছালো তখন ভরা দুপুর। পুরো একটা দিন পেরিয়ে গেছে। ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়েছে সবাই। চা বাগান থেকে চিফ্ মেডিক্যাল অফিসারের গাড়ি তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। মালপত্র নিয়ে গাড়িতে উঠে বসল।

অমিতা বলল, তারপর তোর গল্পের রূপমতীর কি হল?

সেইটুকুই তো জানিনা। ওটা তুই বলবি।

অমিতা গম্ভীর ভাবে বলল, রূপমতী যখন খবর পেল সহদেব মারা গেছে, তখন তার প্রতিহিংসার আগুন স্তিমিত প্রায়। খবর নিয়ে জানলো, বেগম জান্‌জায় সহদেবকে দাহ করা হয়েছে। সেখানে বাঁধানো হয়েছে শহীদের

বেদী। রূপমতী সবার অজ্ঞাতে ঊষা কালে সেখানে রেখে আসত একগাছা ফুলের মালা আর রেখে আসত দুফোঁটা চোখের জল।

বিশাখা হেসে উঠল। বলল, বেশ বেশ, তারপর?

তারপর? একদিন সুলতান সকালে উঠে নগর পরিদর্শনে যাচ্ছে। দূর থেকে ভেসে আসছিল কার যেন ক্রন্দনভরা গীত। সুলতান ধীরে ধীরে এগিয়ে এল। সহদেবের চিতাবেদীতে রূপমতী তখন আকুল হয়ে কাঁদছিল।

সুলতান জিজ্ঞাসা করল, তুমি কাঁদছ কেন? বীরের জন্য অশ্রুপাত কর্তব্য নয়।

রূপমতী মুখ তুলে তাকাল।

সুলতান দেখল একখানা জলভরা মেঘ, মেঘের কোলে বিদ্যুতের আনাগোনা। সুলতান চিনতে পারল তাকে, বলল, তুমি! মুন্সীর পরিবার রূপমতী।

রূপমতী মুখ নীচু করে বসে রইল।

শামসুদ্দিন ধীরে ধীরে ফিরে গেল প্রাসাদে।

সুলতান বুঝতে পারল এতগুলো বেগম তার পক্ষে কেবলমাত্র ভোগ্য পণ্য। ভোগের অতীত যে প্রেম, সেই প্রেমের অধীশ্বর ছিল সহদেব।

সুলতান প্রাসাদে ডেকে পাঠাল রূপমতীকে।

রূপমতী, আমি তোমাকে মন্দির গড়ে দেব। সেই মন্দিরে থাকবে সহদেব, রোকেয়া আর জোবেদার মর্মর মূর্তি, তুমি হবে তার পূজারী। এই মন্দিরে আমিও যাব মাঝে মাঝে, আমি দূরে দাঁড়িয়ে দেখব, অক্ষয় অমর প্রেমের রাজ্যে তোমরা চির ভাস্বর হয়ে রয়েছ।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সুলতান চিৎকার করে উঠল; না, না। তোমাকেও প্রাণ দিতে হবে রূপমতী। তোমাদের সোনার মূর্তি গড়িয়ে প্রাসাদ চত্বরে স্থাপন করব, সেখানে সবাইকে পূজা করব আমি নিজে।

পরদিন সকালে উঠে সবাই দেখল রূপমতীর প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে আছে সহদেবের চিতার বেদীতে। সংবাদ পৌঁছাল সুলতানী দরবারে। সুলতানের চোখের কোনা বেয়ে চার ফোঁটা ব্যথার অশ্রু গড়িয়ে পড়ল গালিচায়। সুলতান দরবার খারিজ করে ছুটে এল সেখানে।

নাটকের পূর্ণ যবনিকা নামল।

বিশাখা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল।

চমৎকার! অমি, তুই কবি, তুই প্রেমিক, তুই শিল্পী, তুই ডাক্তার। তুই যে বহুত্বের দাবীদার তা আজই প্রথম জানলাম।

গাড়ী তখন ছুটছে নীবিড় বনানীর মাঝ দিয়ে। পাথর বাঁধানো রাস্তার দু পাশে ঘন বৃক্ষের সারি। ঘন বৃক্ষের পাতায় ঢেকে গেছে সূর্যের আলো। মাঝে মাঝে পাতার ছিদ্রপথে সূর্যের আলো পাথরের রাস্তায় এসে বিদ্যুতের মত ঝলক দেখা দিচ্ছিলো।

পদ্ম ফিস্ ফিস্ করে বলল, এ বনে মানুষ থাকবে কি করে?

বিশাখা বলল, বন পেরিয়ে গ্রাম পাব নিশ্চয়ই।

পথ যখন রয়েছে, লোকালয়ও রয়েছে। অমিতা মন্তব্য করে মুখ ঘুরিয়ে বসল।

গভীর বনের বুক ভেদ করে গাড়ি এসে দাঁড়াল উন্মুক্ত আকাশের তলে। সামনেই চায়ের বাগিচা। দূরে শ্বেত কপোতের মত চা বাগানের সাহেবদের বাংলো। সবুজ চা গাছগুলোকে ছত্রছায়ে ঢেকে রেখেছে নাম-না-জানা উঁচু উঁচু গাছ। দু পাশে বাগান, মাঝ দিয়ে কালো পীচের রাস্তা। গাড়ি এগিয়ে চলল। অবশেষে এসে দাঁড়াল হাসপাতালের সামনে।

অভ্যর্থনা জানাতে দাঁড়িয়েছিল দুজন বিদেশী আর একজন স্বদেশী, গায়ের রঙ্ ভিন্ন পোষাকের কোন তারতম্য ছিল না তাদের।

পরিচয় পর্ব শেষ করে বাংলোর দরজাতে তাদের নামিয়ে দিয়ে গেল স্বদেশীয় বৃদ্ধ চীফ মেডিক্যাল অফিসার।

নতুন জীবনের এই হল আরম্ভ।

বিশাখা ও অমিতার আলাদা বাংলোর ব্যবস্থা থাকলেও তারা একই বাংলোতেই আস্তানা নিল।

কাজের তালিকা দেখে কেউ-ই নিরুৎসাহ হল না। বিপদ হল পদ্মকে নিয়ে। গয়লা বাড়ির মেয়ে পদ্ম, সে বামুনের হাঁড়িতে হাত দেবে এ ঘটনা কল্পনাতীত। বিশাখা ও অমিতা নানা যুক্তি তর্ক দিয়ে যখন তাকে রাজি করতে পারল না, তখন বিশাখা বিরক্তির সাথে বলল, বেশ তাই ভালো, তুমি

তোমারটা জুটিয়ে নিও, আমরা বাহিরে খাবার ব্যবস্থা করে নেব। হাসপাতালের কাজ শেষ করে এসে রেঁধে খাওয়া তো সম্ভব নয়। দেখি যদি কোন পাচক পাই তা হলে তাকে ডেকে আনব।

বিশাখার বিরক্তি উৎপাদন পদ্মের কাম্য নয়, অনিচ্ছার সাথেই সে রান্না করবার দায়িত্ব নিল। প্রথম দিন যে কুণ্ঠা দেখা গিয়েছিল, কয়েক দিনের মধ্যে সে কুণ্ঠা আর রইল না। তিনজনে পাশাপাশি বসে খেত, তিনজনে একই ঘরে রাত কাটাতো, অনেক রাত অবধি গল্প করত। আজকাল গল্পের মোড় ঘুরেছে। অমিতা আর বিশাখার আলোচ্য বিষয় ছিল বেশীর ভাগই রুগীদের সম্বন্ধে। পদ্ম চুপ করে শুয়ে শুয়ে শুনত, কিছু বুঝত, কিছু বুঝত না।

পাশেই খরতোরা পাহাড়ী নদী। বিকেলবেলায় বিশাখা আর অমিতা যখন হাসপাতালে থাকত পদ্মের তখন কোন কাজ থাকতো না। সে এসে বসত নদীর কিনারায়। বড় একটা পাথরে বসে নদীর কন্‌কনে ঠাণ্ডা জলে পা ডুবিয়ে রাখত। রাতের রান্নার কোন হাঙ্গামা থাকতো না, রাতের বেলায় তিনজনেই হাতেপাতে কাজ করে নিত।

সে দিনও পদ্ম বসেছিল নদীর কিনারায়। বিশাখা অমিতার সাথে বেড়াতে বেড়াতে সেখানে এসে দেখে পদ্ম যেন ধ্যান করছে।

বিশাখা ডাকল, পদ্ম।

ডাক শুনে পদ্ম চমকে উঠল।

নদীর ধারে এলে দেশের কথা মনে পড়ে, না পদ্ম ?

পদ্মের ঠোঁটে বেদনা মিশ্রিত করুন হাসি ফুটে ওঠে, সে কোন কথা না বলে উঠে এসে তাদের পাশে দাঁড়ায়।

অমিতা লক্ষ্য করল, পদ্ম কাঁদছে।

কাঁদছিস কেন পদ্ম ?

পদ্ম কোন জবাব না দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সন্ধ্যা নেমে আসছে, সবাই ফিরে গেছে নিজ নিজ গৃহে। চা বাগানের একটি মেয়ে কুলী যাচ্ছিল পিঠে টুকরি বেঁধে। ডাক্তারবাবুনীদের সন্ধ্যার সময় নদীর ধারে দেখে সে থেমে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে তাদের সামনে এসে বলল, এখানে থাকিস না ভালুকের হামলা হচ্ছে।

ভালুকের কথা শুনে অমিতার চোখে মুখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল, পদ্মের

কাঁদা গেল থেমে। শুধু হাসল বিশাখা। বলল, ভালুক ! বনের ভালুক তো। আসুক না।

না না অতো সাহসে কাজ নেই। চল দিকি বাড়ী ফিরি।

বিশাখা বাধা না দিয়ে পদ্ম ও অমিতার সাথে পা ফেলে সমান বেগে যেতে থাকে। বাংলোয় ফিরে এসে দেখে ছোকরা নেপালী চাকরটা বাতি জ্বেলে রেখে চলে গেছে বারান্দায়। সামনের বাগানের পথ আলোতে চক্ চক্ করছে।

অমিতা বলল, বনবাসে থাকতে পারবি তো বি ?

মানুষ বনে এসে বাস করেছিল বলেই তো জনপদ গড়ে উঠেছিল। বনকে জনপদ তৈরী করে নিতে পারলে কোনই আশঙ্কা থাকবে না।

অমিতা ইজিচেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। পদ্ম গেল রান্নার ব্যবস্থায়। বিশাখা লণ্ঠনটা টেনে নিয়ে বই খুলে বসল।

তুই অতো কি পড়িস ?

যা তুই পড়ে এসেছিস ?

ভাবছি, যা পড়েছি তা যদি ভুলে যেতে পারতাম।

এতো বৈরাগ্য কিসের জন্য বলতো ?

অমিতা কোন কথা বলল না। ইজি চেয়ারে যেমন শুয়ে ছিল তেমনি শুয়ে রইল।

পদ্ম এসে জানালো খাবার প্রস্তুত।

খাওয়া শেষ হতে না হতেই অনেকগুলো লোকের পায়ের শব্দ শোনা গেল। নেপালী চাকরটা এসে বলল, হাসপাতালে রুগী এসেছে।

বিশাখা জিজ্ঞাসা করল, তুই যাবি অমি।

চল দুজনেই যাব।

বিশাখা কি যেন ভেবে বলল, না থাক। আমি একাই যাব। দুজনে রাত জেগে লাভ নেই। তুই বরং ঘুমিয়ে নে, মর্নিং ডিউটি দিস। আমি নাইটটা করে আসি।

অমিতা কিছু বলবার আগেই বিশাখা কাপড় জামা বদলাতে গেল।

বাহিরে অপেক্ষামান কজন কুলীর সাথে বিশাখা এগিয়ে চলল হাসপাতালের দিকে। হাসপাতালের মেট ছিল সাথে। জিজ্ঞাসা করল, কি কেস মেট ?

তাতো জানিনা মেমসাব। কুলী কামিনদের রোগ। কিচনি লেগেছে বলল।

বিশাখা নিঃশব্দে চলতে চলতে হাসপাতালের এমারজেন্সিতে হাজির হল। নার্সও রুগীকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। রুগীর আর্তনাদ আর ছটফটানিতে নার্স বেসামালের মতো। রুগী সামলাতে হিম সিম খাচ্ছে সবাই। বিশাখা এগিয়ে এল রুগীর কাছে। বুঝল, অসময়ে ডেলিভারীর সাথে একলেমেসিয়া।

বিশাখা ফিস্ ফিস্ করে বলল, নার্স, গ্লুকোজ আর ডিজিটিলিন।

সারারাত লড়াই চলল যমে আর মানুষে। সকালের দিকে রুগীর জ্ঞান হল রুগী চোখ মেলে তাকালো। তার দৃষ্টির শূন্যতা বুঝিয়ে দিল দেহের বিকলতার চেয়ে মনের বিকলতা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

সকালবেলায় অমিতা এসে বিশাখাকে মুক্তি দিল। রুগীর অবস্থা বুঝিয়ে দিয়ে বিশাখা বাংলোয় ফিরে এসে বসল ইজি চেয়ারে। গা এলিয়ে দিতে না দিতেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল।

ছুটে এল কমপাউণ্ডার।

ডাকল, ডাক্তার মিস্।

বিশাখার চোখ থেকে তখনও ঘুম ছোটেনি। তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে বলল, কি হয়েছে?

রাতের রুগীটির অপারেশন দরকার।

চমকে উঠল বিশাখা।

হাঁ, ডাক্তার মিস্ চক্রবর্ত্তী আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, দুজন না হলে অপারেশন করতে সাহস পাচ্ছেন না।

আপনি যান আমি আসছি।

হাসপাতালে আসতেই অমিতা বলল, অপারেশন বিনা রুগী বাঁচানো যাবে না। হয় মা, না হয় বাচ্চা কাউকে ছাড়তেই হবে।

তা হলে প্রস্তুত হয়ে নে।

অপারেশন শেষ করে দুজনে এসে বসল অফিস ঘরে, মেমো লিখে চিফের কাছে সংবাদ পাঠাল। অপারেশন মাকে ফিরিয়ে দিয়েছে, সন্তানকে ফেরাতে পারেনি। তবে ভয় তখনও যায়নি, রুগীর জ্ঞান ফেরেনি তখনও।

মেমো পেয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে চিফ এসে হাজির।

সংবাদ নিয়ে খুশীই হল। রুগীকে দেখে তিনি বললেন ভয়ের কিছু নেই। রুগী হয়ত বাঁচবে।

অমিতা বলল, এই আমাদের প্রথম কেস।

তাই বুঝি ভয় পেয়েছেন। শতমারি বৈদ্য জানেন তো।

হয়ত তাই, কিন্তু এর সাফল্যের ওপর আমাদের আত্মবিশ্বাস নির্ভর করছে। তাই আতঙ্কে রয়েছি।

চিফ্ চলে যেতেই নার্স এসে জানালো রুগীর জ্ঞান হয়েছে। সে কি যেন খুঁজছে।

বিশাখা হেসে বলল, মা হবার কামনা তার রয়েছে, সে খুঁজছে সন্তানকে।

কিন্তু বিশাখার ভুল ভাঙ্গতে দেরী হল না।

নাইট করতে এসে বরাবর রুগীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। রুগীও কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেছে। কত কথা যেন তার মনে জমাট বেঁধে রয়েছে। বলবার সামর্থ নেই বলেই বোধহয় বলতে পারছে না।

সকালবেলায় ফিরে এল বাংলোয়। অমিতা তখন প্রস্তুত হয়ে নিয়েছে।

বিশাখা আসতেই অমিতা জিজ্ঞাসা করল, তোমার রুগী কেমন আছে।

এ ধাক্কা সামলে নিল মনে হচ্ছে।

তাহলে আর নাইট করতে হবে না, কেমন!

সেও কপাল। সকাল বিকেল ছিল কাজের তালিকা, অথচ রাত জাগতে হচ্ছে। আমাদের কাজ যে মানুষকে বাঁচানো, সে কথা ভুলতে পারি না। রাতদিন আমাদের সমান।

আজ নাইট করতে হলে আমি করব। তুই দু'রাত ঘুমোসনি, ঘুমিয়ে নিস।

দেখা যাবে কি করা যায়, বলে বিশাখা গেল স্নান করতে।

খেতে এসে অমিতা দুপুর বেলায় খানিকটা ঘুমিয়ে নিল। বিশাখা তখনও বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। অমিতা তাকে না ডেকেই বেরিয়ে গেল বিকেলের ডিউটিতে।

সন্ধ্যাবেলায় অমিতা ফিরে এসে দেখল বিশাখা তখনও ঘুমোচ্ছে। পদ্ম বারান্দায় বসে চটের আসন সেলাই করছিল। অমিতা জিজ্ঞাসা করল, বিশাখা খায়নি ?

না। বলেছে নিজে না জাগলে কেউ যেন না জাগায়।

খেয়ে দেয়ে অমিতা শুতে যাচ্ছিলো, ডাক এল হাসপাতাল থেকে। নতুন রুগী কেমন করছে। অনিচ্ছার সাথে অমিতা বেরিয়ে পড়ল।

অনেক রাতে বিশাখার ঘুম ভেঙ্গে গেল পদ্ম তখনও জেগে বসেছিল।

বিশাখা ডাকল, পদ্ম।

পদ্ম উঠে এসে দাঁড়াল তার সামনে।

অমি কোথায়?

হাসপাতালে গেছে। মেট বলছিল নতুন রুগীর অবস্থা খারাপ।

খারাপ! বিশাখা ভয় পেয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নিয়ে দৌড়ালো হাসপাতালে।

অফিস ঘরে অমিতা একাই গালে হাত দিয়ে ভাবছে। বিশাখাকে শশব্যস্তে ঘরে ঢুকতে দেখে অমিতা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, এত ব্যস্ত হয়ে এলি কেন?

নতুন রুগীর অবস্থা কেমন?

মোটামুটি ভাল।

আর কিছু?

শুনে কাজ নেই।

কেন?

এর অমৃতময় কাহিনী শুনলে খুশী হবিনা, দুঃখ পাবি। তাই বলছি, আর শুনে কাজ নেই। আজকে বুঝতে পেরেছি আমরা বাস করছি আইনশৃঙ্খলার বাহিরে এমন একটি স্থানে যাকে বলা হয় চা বাগান। যেখানে মানুষ আসে প্রাণ হাতে নিয়ে, মর্যাদা ধূলায় লুটিয়ে। অসহায় মানুষকে প্রস্তুত থাকতে হয় অত্যাচারের বলি হবার জন্য।

লণ্ঠনের আলোটা কমিয়ে দিয়ে বিশাখা পাশের চেয়ারটায় বসল।

আজ ভাবছি, না এলেই ভাল করতাম। যার দুঃখ বইবার সামর্থ কম ঈশ্বর যেন তাকেই দুঃখ বইবার একচেটিয়া অধিকার দেন। এই অসমবণ্টন অসহায়ের আতঙ্ক। এখন ভাবছি, আমরা নিরাপদে বাস করতে পারব কি না।

বিশাখা বাধা দিয়ে বলল, তোর ভাবাবেগের কারণ বুঝলাম না। কি হয়েছে বল না।

অমিতা উদাসভাবে বিশাখার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, রুকমানিয়া

সন্ধ্যে থেকে ছট্‌ফট্‌ করছিল, নার্স এসে বলল, রুগীর অবস্থা ভাল নয়। গেলাম দেখতে, পরীক্ষা করে দেখলাম, কোথাও যন্ত্র বিকল হবার কোন আশঙ্কা নেই। জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে রুকমানিয়া ?

বুকে হাত দিয়ে বলল, দরদ।

কয়েকবার বুক পরীক্ষা করে দেখেছি, কোন দোষ খুঁজে পাইনি। ভাবলাম মাসকুলার পেন। গায়ের জামা টেনে খুলতেই দেখলাম সারা বুকে আঁচড়ের দাগ। চমকে উঠলাম। নারকোল কুরানি দিয়ে কে যেন আঁচড়ে দিয়েছে গোটা বুকটা।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে রুকমানিয়া ?

আবার বুকে হাত দিয়া বলল, দরদ। বেদনা আর ঘৃণা ফেটে পড়ল তার একটি মাত্র শব্দের মাঝ দিয়ে। রুকমানিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার চোখের কোনে দেখা দিল অশ্রুকণা। আমি চলে আসছিলাম, রুকমানিয়া ডাকল, মিসিবাবা।

কাছে আসতেই বলল, ছোট্‌সাব্‌।

ছোটসাব মানে ব্রাউন, একদিনই দেখেছি তাকে যেদিন প্রথম এসেছিলাম। যণ্ডার মত চেহারা। কোন হাইল্যাণ্ডার হবে বোধ হয়।

জিজ্ঞাসা করলাম, ছোট্‌ সায়েবকে ডাকিয়ে পাঠাব ?

চমকে উঠে রুকমানিয়া হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। কোন রকমে তাকে থামালাম, সে বলল, না, না ওকে ডাকাস না। ওটা মানুষ নয় শয়তান।

কথাগুলো শেষ করে রুকমানিয়া হাঁপিয়ে পড়ল। নার্সকে ডেকে দিয়ে চলে এলাম অফিস ঘরে। রুকমানিয়ার অস্পষ্ট কথায় কি যেন ভয়ঙ্করের ইঙ্গিত দিল। বসে ভাবছিলাম।

নার্স এল।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি খবর নার্স ?

নার্স কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে চলে যাচ্ছিল। ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, কিছু না বলেই চলে যাচ্ছ কেন ? কিছু বলতে চাও ?

আমি ছুটি চাই। মৃদুস্বরে নার্স বলল, বলার ভঙ্গীটা কেমন যেন আতঙ্ক জ্ঞাপন করছিল।

বললাম, ছুটি দেবার মালিক চিফ্, আমরা রেকমেণ্ড করতে পারি। বদলি লোক না পেলে তাও হয়ত সম্ভব হবে না।

তা হলে চাকরি ছাড়তে হবে।

কেন ?

এখানে আর থাকতে পারছি না।

বড়ই নির্জন, বড়ই এক ঘেয়ে, তাই বুঝি।

ঠিক তা নয়। এর চেয়েও নির্জনে থাকতে রাজি আছি কিন্তু এখানে নয়।

আমি কিছুই বলতে পারলাম না। নার্স বলতে লাগল, আমি নীরব শ্রোতা।

রুকমানিয়াকে ব্রাউন সাহেব ধরে নিয়ে গিয়েছিল। গর্ভবতী রুকমানিয়া বাধা দিয়েছিল, তাই তার এই দশা।

নার্সের কথা শুনে আমার দেহটা ঝিমিয়ে এল।

আজ তিন বছর এখানে আছি। এরকম ঘটনা হামেশাই ঘটে। তবে এত ভয়ঙ্কর নয়। ব্রাউনের অত্যাচারে কুলীদের ঘরে যুবতী মেয়ে নিরাপদে বাস করতে পারে না।

আবার মৃদুস্বরে বলল, তাই ঠিক করেছি, এই পরিবেশ থেকে চিরকালের না হলেও সাময়িক বিশ্রাম চাই। সাময়িক বিশ্রামের জন্য আমার ছুটির প্রয়োজন।

একথা কাউকে বল না কেন ?

কাকে বলব ?

বড় সায়েবকে।

পরদিন রাতে আমাকে আর কোয়ার্টারে থাকতে হবে না। আরেকটি রুকমানিয়া হাসপাতালে আসবে ক্ষত বিক্ষত দেহ নিয়ে।

নার্স কেঁপে উঠল। তাকে বিদায় দিলাম। বললাম, কালকে তোমার ছুটির কথা চিফ্‌কে লিখে দেব, যাতে বদলি লোক শীগ্‌গীর আসে তারও ব্যবস্থা করতে লিখব।

নার্স চলে যাবার পর গালে হাত দিয়ে ভাবছিলাম। তুই এলি বলেই ভাবনার সুতো ছিঁড়ে গেল।

বলা শেষ করে অমিতা চোখ বুঁজে রইল।

বিশাখা বলল, যারা সভ্যতাদর্পী তাদের এই চরিত্র।

অমিতা বলল, তাই ভাবছিলাম। নে, এবার বাংলোয় চল।

মেট আর দুজন লণ্ঠন হাতে নিয়ে এগিয়ে দিয়ে এল তাদের।

কদিন পরে পদ্ম বিশাখাকে ধরে পড়ল, আমাকে কিছু কাজ দাও বিশাখা দিদি। বসে থাকতে থাকতে হাত পা যে শক্ত হয়ে গেল।

কি কাজ করবি ?

হাসপতোলের কোন কাজ।

ভয় পেয়ে যাবি, ওকাজ তুই পারবি কেন !

ঠিক পারব বিশাখাদিদি। আমাকে কাজে লাগিয়েই দেখ, পারি কি না ! মেহনতকে আমি ভয় করি না। তোমাদের মতো রাত জেগে কাজ করতে পারব।

অনিচ্ছার সাথে হলেও বিশাখা পদ্মকে নিয়ে হাসপাতালের কাজে লাগিয়ে দিল। কয়েকদিনের মধ্যেই পদ্ম কাজের ধারা ও করনীয় অনেক কিছু শিখে ফেলল।

পদ্মের কাজের ধরন দেখে অমিতা বলল, দেখলি বি, আমাদের পদ্ম ট্রেনড্ দাইকেও হার মানিয়েছে। এবার চিফ্‌কে বলে ওর মাইনে করে দিতে হবে।

বিশাখাও তাই চায়। পদ্ম যদি স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে তাতে সে সুখীই হবে।

একদিন সন্ধ্যার পর বড় সাহেব বৃদ্ধ গ্যারিক কোন রকম সংবাদ না দিয়েই উপস্থিত হল তাদের বাংলোতে। বিশাখা, অমিতা আর পদ্ম সবেমাত্র চায়ে চুমুক দিয়েছে এমন সময় জুতার মচ্‌মচানি শুনে ফিরে তাকাল।

গ্যারিককে দেখে তারা উঠে দাঁড়াল। বসতে বলল। গ্যারিক চেয়ারে বসেই বলল, বড়ই দরকারে এসেছি তোমাদের কাছে। তোমাদের বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটালাম, ক্ষমা কর।

তিনজনই উৎসুক হয়ে গ্যারিকের কথা শুনছিল। গ্যারিক বলতে থাকে, জানোতো যুদ্ধ হচ্ছে আজ চার বছর ধরে। আমাদের জাতীয় জীবনের এটা হল সন্ধিক্ষণ।

তিনজনেই মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

যুদ্ধ চলেছে আমাদের এই বাগান থেকে দেড় দুই শো মাইলের মধ্যে।

আজ সরকার থেকে তলব এসেছে, ব্রাউন চলে যাচ্ছে যুদ্ধে। আমি বুড়োমানুষ, আমাকে ডাকেনি। লাস্ট ওয়ারে আমিও গিয়েছিলাম। এবার যেতে পারছি না। দুঃখজনক, তবুও ঘরে বসেই যুদ্ধের কাজে সাহায্য করা আমার ধর্ম। এখুনি খবর পেলাম, আমাদের হাসপাতালটা ছেড়ে দিতে হবে যুদ্ধ ফেরতা আহত সৈন্যদের জন্য। তোমাদের একটা বাংলো খালি আছে, সেটাতে রুগীদের সরিয়ে নিতে হবে।

বিশাখা মৃদুস্বরে বলল, আপনার প্রস্তাব উত্তম। কিন্তু হাসপাতাল কোন বাগানের নিজস্ব সম্পত্তি নয়, কিছু করতে হলে চিফের আদেশ প্রয়োজন।

সে আদেশ তোমরা পাবে। অগ্রিম জানিয়ে গেলাম যাতে তোমরা প্রস্তুত হতে পার। ডেকে পাঠিয়েছি মেজর দাসকে। সেও এসে পড়বে, তার সাথে পরামর্শ করেই আমি ব্যবস্থা করব। আমি শুধু তোমাদের সহযোগিতাটুকু চাই। বুঝলে।

গ্যারিক কথা শেষ করেই অন্ধকারে নেমে গেল।

অমিতা বলল, এবার মানুষ বাঁচবে।

কেন ?

ব্রাউনটা দূর হচ্ছে, ঐ আপদ গেলেই সবাই নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে।

পরের দিনই হাসপাতাল সরানো আরম্ভ হল। অমিতার বাংলোর চার-পাশে কয়েকখানা টিনের দোচালা তোলা হল। ওষুধপত্তর যন্ত্রপাতি সরানো শেষ না হতেই লরী বোঝাই আহত সৈন্য আসতে লাগল।

বিশাখা আর অমিতা বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে সৈন্য চলাচলের দৃশ্য। কোলকাতার হাসপাতালে যত রুগী দেখেছে তারচেয়ে সংখ্যায় কম নয়। স্থান সঙ্কুলান না হওয়াতে কুলীমজুর লেগে গেল নতুন চালা তুলতে। নতুন টিনের চালায় রুগীদের গাদা দিয়ে ফেলতে থাকে নির্মম ভাবে।

চিফ্ এসে খবর দিয়ে গেছে, প্রয়োজন মত যুদ্ধ বিভাগের ডাক্তার এসে পৌঁছায়নি। চা বোর্ডের ডাক্তারদেরই চার্জ নিতে হবে এই অসংখ্য রুগীর। বিশেষ করে অপারেশন থিয়েটারে থাকতে হবে বিশাখা আর অমিতাকে। অবসর সময়ে মাতৃমঙ্গলও দেখতে হবে।

যুদ্ধ বিভাগের দুজন ডাক্তার এসেছিল। তারা বিশাখা ও অমিতাকে নার্স মনে করেই উপদেশ দেবার চেষ্টা করেছিল।

গ্যারিক এসে পরিচয় করে দিতেই মারাঠী ডাক্তার পাট্‌কে আর সিন্ধী ডাক্তার লালওয়ানী লজ্জিত হল।

পাট্‌কে বলল, আমরা দুঃখিত।

অমিতা হেসে বলল, কেন? আমরা ডাক্তার, এই জন্য।

ভুল বুঝবেন না ডাক্তার চক্রবর্তী। বাংলার জলবায়ুর সাথে আমরা মোটেই পরিচিত নই, তাই বুঝতে পারিনি। দুঃখিত, খুবই দুঃখিত।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছুরি চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে উঠল বিশাখা আর অমিতা। নরহত্যার কোন অভিযোগ না থাকলেও, তাজা মানুষের দেহে যে ভাবে ছুরি চালাতে হয় তার ধকল মেয়েদের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। দুজনেই চিফের কাছে আপত্তি জানালো। তারা জানালো, মাসে দু একটা কাটা ফোড়া সম্ভব, প্রতিদিন দশ পনরজন মানুষের দেহে ছুরি চালানো মেয়েদের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়, রুচিকরও নয়।

অতি ব্যস্ততার সাথে চিফ্ দেখা করল পাট্‌কে আর লালওয়ানীর সাথে। তারা যুক্তি পরামর্শ করে ঠিক করল, অপারেশন থিয়েটারে পর্যায়ক্রমে পাট্‌কে অথবা লালওয়ানীকে থাকতে হবে। মেজর অপারেশন তাদেরই করতে হবে। মেয়ে ডাক্তারের পক্ষে যা করা সম্ভব এবং উচিত তাই তারা করবে।

পরদিন থেকে সকালের কাজ পড়ল অমিতার আর পাট্‌কের। বিকেলের কাজ পড়ল বিশাখা আর লালওয়ানীর।

লালওয়ানী তেইশ বছর চাকরি করছে। ফৌজী হাসপাতালের পেটেণ্ট চিকিৎসাই করে এসেছে এতকাল। শান্তির সময় কাটাকাটির প্রয়োজন হয়নি। যুদ্ধ আরম্ভ হতেই এই হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছে। তাকে বেশী নির্ভর করতে হয় বিশাখার ওপর। কার্যকালে দেখা গেল লালওয়ানী দর্শক মাত্র, বিশাখাকেই ছুরি চালাতে হয় সর্বক্ষণ।

এতে আর কিছু হোক না হোক লালওয়ানীর স্নেহ সঞ্চিত হতে থাকে বিশাখার প্রতি। মাঝে মাঝেই বলে, যদি তোমার মত আমার একটি মেয়ে থাকত!

বিশাখা সামান্য হাসি দিয়ে তার স্নেহপূর্ণ উক্তির জবাব দিত।

পাট্‌কে নতুন পাশ করা ডাক্তার। মানুষ বাঁচাবার চেয়ে শেখবার দিকে তার ঝোঁক বেশি। অমিতা য়্যানেসথেসিয়া করেই খালাস। দু চারটে সেলাই ভিন্ন বিশেষ কাজ তার ছিল না। পাট্‌কেই সব কাজ করত।

অপারেশন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এসে দু জনে মুখোমুখি চেয়ার পেতে বসত। রুগী সম্বন্ধে আলোচনা করত। কাজ শেষ হলে যে যার মতো ফিরে যেত।

পাট্‌কে একদিন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, এই বনে তোমরা কেন এসেছ? অমিতা উত্তর না দিয়ে চুপ করে বসে মেডিক্যাল জার্ণালের পাতা উল্টে দেখতে থাকে।

পাট্‌কে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করতেই অমিতা বলল, ওটা ব্যক্তিগত বিষয়।

আমি দুঃখিত। তোমাকে আঘাত দেবার জন্য জিজ্ঞেস করিনি।

অমিতা কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল।

কথান্তরে যাবার জন্যেই পাট্‌কে বলল, কাল রাতে একটা গুরুতর অপারেশন হয়েছে, শুনেছ?

শুনেছি। দুখানা পা কেটে ফেলতে হয়েছে। এখনও তার জ্ঞান হয়নি। বোধহয় বাঁচবে না। মেজর লালওয়ানীর কেস। ডাক্তার চৌধুরী অপারেশন করেছে। ভাগ্যি, তোমাকে করতে হয়নি।

আমি করতে পেলে খুশী হতাম।

অমিতা মৃদু হেসেই উঠে যাচ্ছিল। পাট্‌কে বলল, তুমি ভয় পেয়েছ মনে হচ্ছে?

এদেশের লোকেরা কি বলছে জানো। তারা বলছে, মেয়ে দুটো ডাক্তার নয়। সাক্ষাৎ শয়তান। নইলে তারা এমন ভাবে মানুষের গায়ে ছুরি বসাতে পারত কি! বনের মানুষ সব সময় বনমানুষ হয় না। শহুরে মানুষও শয়তান হয়।

তাই বলছে নাকি। স্বাভাবিক। এতকাল এরা মেয়েদের দেখেছে রান্নাঘরে। হঠাৎ তাদের দেখল হাসপাতালে। তাতেও ক্ষান্তি নেই, এবার

দেখছে ছুরি হাতে। সবটাই ওদের কাছে নতুন এবং ভয়ঙ্কর। নতুন কিছু সাধারণ মানুষ সহজে গ্রহণ করতে পারে না, কেমন বদহজম হয়।

অমিতা ফিরে গেছে বাংলোয়। দিনের পর দিন মাসের পর মাস 'এমনি ধারা কাজের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে। কাজ শেষ করে এসে বাংলোয় বসেছে। বিশাখা ফিরে আসলে বারান্দায় ইজি চেয়ার পেতে বসে অনেক রাত অবধি গল্প করেছে। কোন কোন দিন মাতৃমঙ্গল থেকে ডাক এলে উঠে যেতে হয়েছে। এমনি করেই দিন গড়িয়ে যায় বাঁধাধরা নিয়মের মাঝ দিয়ে।

বাবা লিখেছেন, অমি, তুই ফিরে আয়। আমি বেঁচে থাকতে তোকে বনবাসী হতে দেব না। অমিতা বারবার করে চিঠিখানা পড়েছে, পিতৃ হৃদয়ের ব্যথাটুকু খুঁজে দেখেছে ঐ কয়েকটি ছত্রে। অনেক ভেবে চিন্তে উত্তর দিয়েছে, এটা বনবাস নয়, কর্মাশক্তি।

কর্ম-ই কি সব! তা যদি না হত বিশাখা কি করে হাসিমুখে দিন কাটাচ্ছে! বিশাখা তার পাঠ্য জীবনের সাথী, কর্ম জীবনের সাথী কিন্তু বিশাখাকে আজও সে বুঝতে পারেনি। অনেক সময় বিশাখার কথা ভেবেছে কিন্তু কোন সদুত্তর খুঁজে পায়নি।

পাটকের ছুটি মঞ্জুর হয়েছে। দু বছর ধরে এই নির্জন বনে থাকতে থাকতে সেও হাঁপিয়ে উঠেছে।

অপারেশন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে পাটকে বলল, দেশে যাচ্ছি ডাক্তার মিস্ চক্রবর্তী। দু বছর পর তিন মাসের ছুটি পেয়েছি।

ছুটি! ভালোই। আমিও ভাবছি, ছুটি নেব।

পাট্‌কে ভাবাবেগে বলে উঠল, বাবা-মাকে কতদিন দেখিনি।

অমিতা চুপ করে রইল। পাটকেও থেমে গেল। তার মন তখন ফিরে গেছে মারাঠার পার্বত্য অঞ্চলের ছোট্ট গ্রামটায়। সেখানে তার মা বাবা রয়েছে, রয়েছে ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্খা।

পাট্‌কে বলল, কি ভাবছ ডাক্তার?

কিছু না। তুমি ফিরে যাবে দেশে, পথ চেয়ে বসে আছে কতজন।

কতজন নয়, দুজন। বাবা-আর মা। ছোটভাই আছে মিশরে। সেও গেছে যুদ্ধে। আমরা দুভাই অথচ দুভাই রয়েছি ফৌজে। বাবা মায়ের দুঃখের অন্ত নেই।

পাটুকে কিছুক্ষণ থেমে গেল, তুমিও তো ছুটি খুঁজছ, বাবা মায়ের কাছে যাবে বলেই তো ?

হুঁ ।

পাটুকে জিজ্ঞাসা করতে চাইছিল অন্য কিছু। সেদিনকার 'ব্যক্তিগত' কথাটা মনে হতেই সে থেমে গেল। হঠাৎ অমিতা জিজ্ঞাসা করল, তোমার দেশে আমাকে নিয়ে যাবে।

যাওয়া সহজ, ফেরা সহজ হবে কি ? হাসল পাটুকে।

পাটুকের কথায় অমিতা চমকে উঠল। আত্মগোপনের আশায় প্রতিবাদের সুরে বলল, আমি অভিমন্যু নই ।

সৌভাগ্য। কিন্তু তোমার পক্ষে যখন ফেরা সহজ হবে, তখন যাওয়া হবে কঠিন। শুধু কঠিন নয়, ভয়ানক কঠিন। মানুষের দেহে ছুরি চালাতে চালাতে মনের গঠন তৈরী করেছ পাথরের মত। পাথরের বুকের ওপর দিয়ে ঝরণা বেয়ে গেলেও পাথর ভেজেনা।

তুমি কি বলতে চাও ?

কিছুই না। ডাক্তারের পরিভাষা হৃদয়হীনতা নয়। এইটে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

অমিতা ফিরে এল বাংলোয় ।

বিশাখা স্নান করে আসতেই বলল, আমি ছুটি নেব। ছুটি নিয়ে পাট্‌কের সাথে বেড়াতে যাব তার দেশে।

অদ্ভুত এই প্রস্তাবে বিশাখা বিস্মিত হল। বলল, তা ভালোই।

ভালোই মানে ?

মানে, তোর মনের কণ্টক বনে গোলাপের চারা পুঁতেছে পাট্‌কে।

হয়ত তাই। তোর কোন আপত্তি আছে ?

আমার ? মোটেই নয়। তবে মানুষ জাতটা, সে স্ত্রীই হোক আর পুরুষই হোক বড়ই বেইমান, বড়ই ভুলো তাদের মন। তাই ধর্ম দিয়েছে গেরো দেবার নির্দেশ, সমাজ দিয়েছে আঁচলে বাঁধবার উপদেশ; মন বলছে, রঙ্ ছুটবার আগেই তুলি বুলিয়ে নিও।

অমিতা গম্ভীর হয়ে গেল ।

বিকেল বেলায় পাট্‌কে এল বেড়াতে। আর সাতদিন পর তার ছুটি

সুরু। বিকেলে হাসপাতালের কাজ কম। সময় কাটাবার আশায় এসে উঠল অমিতাদের বাংলোতে। মাঝে মাঝেই সে এসে অনেক রাত অবধি গল্প করেছে। অমিতাকে দেখেই হেসে বলল, তা হলে তুমি আমার সাথে যাচ্ছ ?

অমিতা জবাব খুঁজে না পেয়ে চুপ করে বসে রইল।

ভাবছো কি ?

যেতাম, কিন্তু যাওয়া সম্ভব নয়। তোমার সাথে যাবার অধিকার আমার নেই।

যদি অধিকার সৃষ্টি হয়।

অমিতা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। বৈকালি সূর্যের আলোটা মুখে এসে পড়তেই অমিতার মৌনভাব কেটে গেল। তখনও দ্বন্দ্ব শেষ হয়নি, কোথায় কে যেন তার তানপুরার কান মুচড়ে সুর সৃষ্টিতে বাধা দিচ্ছে। দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে বলল, অধিকার লাভ এতো সহজে তো হয়না।

যতই কঠিন ভাবে হোক তারই চেষ্টা কর।

পাট্‌কে হাসল। সরলতাভরা সেই হাসির জোয়ারে অমিতা ফিরে পেল সারাজীবনের সব সমস্যার উত্তর।

পাট্‌কে ফিরে যাবার পরও অমিতা অনেকক্ষণ একাকী বসে রইল বারান্দার চেয়ারে। বিশাখা দুবার এসে তাকে দেখে গেছে, কোন কথা বলেওনি, জিজ্ঞাসাও করেনি। পদ্মও একবার এসে দেখে গেছে। অমিতা যেন ধ্যান করছে।

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে নেপালী চাকরটার নাম ধরে ডাকল।

লণ্ঠন নিয়ে চল আমার সাথে হাসপাতালে।

নেপালী চাকর অমিতার পেছন পেছন লণ্ঠন নিয়ে চলতে লাগল। হাসপাতালের সামনে এসে বলল, না, এখানে নয়, ক্যাপ্টেন পাট্‌কের বাংলোয় চলো।

বাংলোর দরজায় চাকরকে বসতে বলে অমিতা দরজায় ধাক্কা দিল।

দরজা খুলে দাঁড়াল পাট্‌কে।

অমিতা। তুমি! এত রাতে!

হাঁ। আমি। চমকে উঠলে কেন ?

অনেক রাত তাই বলছি।

তাতে তোমার আপত্তি আছে ?

মোটেই নয়।

তা হলে অমন করে উঠলে কেন ?

এটা মিলিটারী ব্যারাকের বাংলো।

আমি ডাক্তার। আমার যাতায়াত অবাধ।

পাট্‌কে লজ্জিত ভাবে এগিয়ে এসে হাত ধরে বলল, বস, নিশ্চয়ই কোন গুরুতর কিছু ঘটেছে।

আজ সন্ধ্যার পর যে কথা হয়েছিল সে কথা তোমার মনে আছে ?

আছে। তুমি বস।

অমিতা বসল।

তারই পরিপ্রেক্ষিতে একটা কথা বলতে এসেছি। তুমিতো আমাকে জানো না, পরিচয়টা দিয়ে রাখা ভাল, নইলে বলবে আমি বঞ্চনা করেছি। আর পরিচয়টা নিয়ে রাখাও ভাল, নইলে তুমিও আমার শ্রদ্ধা হারাবে।

পাটকে এই প্রসঙ্গ সম্বন্ধে মোটেই প্রস্তুত ছিল না, অমিতার বক্তব্য শুনে অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগল। বলল, বেশ বল।

আমার এক পুরুষ বন্ধু ছিল। তার নাম সলিল। দুজনে বিয়ে করব ঠিক করেছিলাম। বিয়ে হয়নি। সলিল আমাকে গোপন করে বিয়ে করে আমার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছে।

পাট্‌কে উদগ্রীব ভাবে শুনতে শুনতে বলল, তাতে আমার কি এসে যায়।

তোমাকে যদি ভালবাসতে না পারি, অর্থাৎ যতটা ভালবাসা উচিত।

তুমি লেখাপড়া শিখে বোকার মত কথা বলছ। ভালবাসার কোন মিটার নেই। সাহচর্যে যে মমত্ববোধ জন্মায় তা যখন ঘনীভূত হয় তখন তা হয় ভালবাসা। যদি পরস্পরের মমত্ব বোধ না থাকে তা হলে ভালবাসা মিথ্যা হয়।

অমিতা চুপ করে গেল।

আর তোমার কিছু বলবার আছে ?

মৃদুস্বরে অমিতা বলল, তোমারওতো এমন হতে পারে।

যদি হয়, তা সংশোধন করবার অবসর দেবে আমাকে, সংশোধন করতে সাহায্য করবে তুমি।

তোমার পিতা মাতা যদি আমাকে গ্রহণ না করে ?

বিয়েটা যখন তারা করবেন না, তখন যে বিয়ে করবে সে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করলেই যথেষ্ট।

অমিতা উঠে দাঁড়াল।

তোমার উত্তর পেয়েছ।

কাল বলব।

অমিতা ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। নেপালী চাকরটা তখনও বসেছিল, তাকে ডেকে নিয়ে রওনা দিল বাংলোর দিকে।

পাট্‌কে তখনও দাঁড়িয়ে ছিল বারান্দায়।

বিশাখা ঘটনার পরিণতির জন্য প্রস্তুত ছিল। সে জানত অমিতা এবার ভুল করবে না। যেদিন অমিতা আর পাট্‌কে জোড় বেঁধে এসে বিদায় নিল সে দিন বিশাখা কোন শুভেচ্ছাও জানাতে পারল না। অথচ তাদের গাঁটছড়া বেঁধে দিতে কর্মক্লান্ত দিনের মাঝেও বিশাখা সময় করে নিয়েছে। বিবাহের নিমন্ত্রণে যারা এসেছিল তারা প্রশংসা করেছে, বিশাখার। তার নিজের পক্ষে অতিথি অভ্যাগতদের পরিচর্যা করা সম্ভব হবে, একথা বিশাখাও ভাবেনি। বিয়ের আসরে লালওয়ানী বিশাখাকে বলেছিল, নাউ ইওর চ্যান্স মাই ডটার্।

বিশাখা লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছিল। মনের কথা গোপন করে হেসে বলেছিল, আই কাণ্ট এলাউ এ শেয়ার হোল্ডার অব ইওর অ্যাফেক্সান।

হ্যাট্‌স গুড্, হ্যাট্‌স গুড্,বলে, প্রবীন লালওয়ানী বারবার মাথা নেড়ে আনন্দ প্রকাশ করেছিল।

চা বাগানের গাড়ি করেই অমিতা আর পাট্‌কে রওনা হল। বিদায় সম্ভাষণ জানাতে যারা এসেছিল তারা রুমাল নেড়ে আনন্দ জানিয়েছে, বিশাখা তা পারেনি। নিঃসঙ্গতাকে জীবনের একমাত্র প্রাপ্য বস্তু বলেই সে জেনেছে। আসা যাওয়াকে মেনে নিয়েছে সৌরজগতের গতির মতো ধ্রুব বলে। তাই অমিতার প্রস্থান-পর্ব তার সব অনুভূতির বাইরে ছিল। আতিশয্য না থাকায় সে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে যায়নি।

বিশাখা চোখ মুছে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিল। বিরাট একটা ঝঞ্ঝা

যেন বয়ে গেছে তার জীবনের ওপর দিয়ে। পাতাঝরা শুকনো গাছের মত নীরস ও অসার মনে হল নিজেকে।

পদ্ম এসে ডাকল, বিশাখাদি, খাবে না?

না।

অনেক রাতে বিশাখা উঠে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল। আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে রাত পোহাল। আবার কাক ডেকে উঠল, আবার শোনা গেল বাগানের ভোঁ, আবার এসে ডাক দিল হাসপাতালের মেট। বিশাখা কোনরকমে টলতে টলতে বাথরুমে ঢুকে টবের জল তুলে অনবরত ঢালতে লাগল মাথায়।

অনেকটা শান্ত হল দেহটা।

বিশাখা পোষাক বদলে এ্যাপ্রন জড়িয়ে বেরিয়ে গেল।

পাট্রকে এবং অমিতা দুজনেই চিঠি দিয়েছে। আবেগ উচ্ছ্বাসপূর্ণ চিঠি-গুলোর প্রাপ্তি স্বীকার ভিন্ন আর কিছুই বিশাখা লিখতে পারেনি। তাদের ছুটিও ফুরিয়ে এসেছে। আবার তারা ফিরে আসবে, আবার তারা আনন্দমুখর করে তুলবে এই বনভূমি। যুদ্ধ থেমে আসছে, এবার তারা পাবে সুখের ঘর। অমিতার চিঠিতে জানতে পারল শীঘ্রই তারা ফিরে আসছে বাগানে। আবার সে পুরানো কাজেই বহাল হবে। পাট্রকেও আসবে হাসপাতালের দায়িত্ব নিয়ে। অমিতার পুনরাগমন প্রীতিপদ হলেও ভরসার মতো নয়। অমিতা আর পাট্‌কে আসবার আগেই পালিয়ে যাবার দুরন্ত নেশা পেয়ে বসল তার মনে।

বিকাল বেলায় পুরাতন খবরের কাগজের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বিশাখা পদ্মকে ডেকে বলল, পদ্ম দেশে যাবি?

পদ্ম খুসী হয়েই বলল, চলুন একবার বেড়িয়ে আসি। দু বছরের ওপর জঙ্গলে বসে আছি। মানুষের মুখ দেখতে পাব সেখানে।

তাহলে ছুটির দরখাস্ত করি, কেমন?

পদ্মের মতামতের অপেক্ষা না করেই বিশাখা দরখাস্ত পাঠিয়েছিল।

দরখাস্ত পেয়েই চিফ্‌ ডেকে পাঠাল তাকে।

কমাস পরে ছুটি নিলে হতনা? গম্ভীর ভাবে মেজর দাস জিজ্ঞাসা করল।

অমিতা তো এসেই যাচ্ছে। ফৌজী হাসপাতালেও বহু ডাক্তার এসেছে। এখন ছুটি না নিলে পরে কাজ বৃদ্ধি হলে ছুটি নেওয়া ও দেওয়া দুটোই মুস্কিল হবে।

বেশ। কিন্তু তিন মাসের নয়, একমাসের ছুটি।

চিফ্ সই করে দরখাস্তখানা সরিয়ে রেখে বলল, আবার আসবেন তো ?

ইচ্ছা আছে।

একথা আগেও দুজন বলেছিল, তারা আর আসেনি। বনের এই সঙ্গীহীন জীবন মানুষকে আকর্ষণ করেনা। নিরিবিলি থাকতে চায় মানুষ কিন্তু বেশি দিন তা সহ্য করতে পারে না। তাই যারা আসে সাময়িক উত্তেজনায় অথবা আবেগে তারা ফিরে যায় তেমনি উত্তেজনা আর আবেগ নিয়ে।

মিথ্যা নয়।

তা হলে আপনিও তাই করবেন কি ? বলেই মেজর দাস অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল বিশাখার জবাব পেতে।

আমি তো মানুষ। প্রতিশ্রুতি দেওয়া আর তা রক্ষা করা পারিপার্শ্বিকতার ওপর নির্ভর করে। জোর করে বলতে পারছিনা, তবু ফিরে আসবার চেষ্টা থাকবে সব সময়।

বিশাখা ফিরে এসে পদ্মকে বলল, পদ্ম, গুছিয়ে নে সব।

আর আসবে না বিশাখাদি ?

তা জানি না। আসব না মনে করেই রওনা হব। যদি আসি, আবার সবকিছু নিয়ে আসব।

চা-বাগানের লরীতে বিশাখা পদ্মকে সাথে নিয়ে আবার এল জয়ন্তী ষ্টেশনে। সেবার আসবার সময় অমিতা ছিল সাথে এবার তারা দুজন মাত্র। এই পথেই অমিতাও গেছে পাট্রিকের সাথে। সেদিন বিশাখা অমিতার প্রয়োজন ছিল না। মানুষ আপন করে ভাববার মতো সঙ্গী পেলে বোধহয় ভুলে যায় পেছনে যাদের রেখে এসেছে। নারী জীবনে পুরুষ-সঙ্গী পাওয়াই হল কাম্য, এ কামনার পশ্চাতে যুগযুগান্তের সৃষ্টিধর্ম লুকিয়ে রয়েছে ; রয়েছে আপন করে ভাববার জন্মগতবৃত্তি। মানুষ শুধু নয়, প্রাণসম্পদ যাদের রয়েছে তারাই চেয়েছে বাঁচতে ; বাঁচবার সুযোগ পেলেই তারা খুঁজছে সৃষ্টির পথ। অমিতাও

সন্ধান করেছে এই শাশ্বত প্রাণধর্মের পরিবেশ, সেখানে বিশাখা অবান্তর, অবান্তর পিতামাতার স্নেহধন্য হৃদয়।

কিন্তু বিশাখা নিজে কি পেয়েছে! বিশাখা অনুসন্ধান করতে থাকে নিজের মনোজগতে। এক একটা দিনকে বিশ্লেষণ করে হৃদয়ের সকল অনুভূতি দিয়ে। অভিমান তাকে ঘরছাড়া করেছে, অভিমান তাকে টেনে নিয়ে গেছে জীবন গঠনের সাধনায়, অভিমান তাকে জোর কদমে হাজির করেছে লোকালয় বহির্ভূত এই বন প্রদেশে। কিন্তু সমাপ্তি আসেনি এখনও।

সন্দীপ এসেছে, প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

রাধানাথ এসেছিল ধূমকেতুর মত, তাকে দেখা গেছে, স্পর্শ করতে পারেনি; আঘাত দেবার উৎকট চেষ্টা করেছে, সে আঘাত ফিরে এসে বুমেরাং-এর মত তাকেই ধরাশায়ী করেছে।

বিশাখা ভুলে গেছে নিজের অস্তিত্ব।

পদ্ম ডেকে বলল, বিশাখাদিদি, গাড়ি বদল করতে হবে।

বিশাখা তাকিয়ে দেখল, রাজাভাতখাওয়া পৌঁছে গেছে। দলসিং পাড়া যাওয়ার গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে উল্টো দিকে। গাড়ি বদল করে স্থির হয়ে বসল।

আবার গাড়ি চলতে থাকে।

পদ্ম খাবার গুছিয়ে সামনে এনে দিল।

তুই খা পদ্ম, আমার খিদে নেই।

তাকি হয় সেই কাল সকালে পৌঁছাব সান্তাহারে। কিছু মুখে না দিলে চলে কি।

পদ্ম বিশাখাকে জানেনা, জানবার অবসরও হয়নি।

অসন্তুষ্ট হয়েও বিশাখা রাগ করতে পারল না। হেসে বলল, দে, কিন্তু অল্প দিস। খিদে নেই।

সারারাত বিশাখা জেগে কাটিয়েছে। একটার পর একটা ষ্টেশন এসেছে। মুখ বাড়িয়ে ষ্টেশনের নাম দেখবার চেষ্টা করেছে। আবার বসেছে চুপটি করে, নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে চিন্তার রাজ্যে। বিশাখার মনে হল, রেলের ষ্টেশনের মত মানুষের জীবনেও তো ষ্টেশন রয়েছে। গতি রয়েছে, আকস্মিক দুর্ঘটনা রয়েছে, আর শেষ ষ্টেশনে গিয়ে যাত্রা বিরতি হয়েছে। শেষরাতে বিশাখা যেন

খুঁজে পেল তার সকল প্রশ্নের উত্তর। যাত্রা বিরতিই জীবনের ধর্ম। যাত্রা বিরতির প্রয়োজন হয়েছে তার জীবনে।

সান্তাহারে গাড়ি বদল করে আবার যাত্রা হল সুরু।

গাড়ি এসে দাঁড়াল নাটোরে।

মালপত্র নিয়ে বিশাখা নেমে পড়ল পদ্মের সাথে।

এখানে নামলে কেন বিশাখাদিদি?

রাজসাহী হয়ে যাব পদ্ম। আজই পৌঁছাতে হবে। বড়ই দেরী হয়ে গেছে, সময় আমাদের কমে এসেছে, আর দেরী করা সম্ভব নয়।

বিশাখার কথা পদ্ম বুঝতে পারল না।

কি দেখছিস মুখের দিকে চেয়ে। চল। এই কুলি, বাসে মাল উঠাও।

পথ যেন আর ফুরোয় না। বাস থেকে নেমে সোজা এল রাজসাহী ষ্টেশনে। সেখান থেকে আমনুরা। আমনুরায় বিকেল বেলায় পৌঁছে বিশাখা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ফুরিয়ে এসেছে তার পথ। গৃহ সন্নিকটে এসেই মানুষ ব্যস্ত হয়ে ওঠে বেশি। এতক্ষণ তবুও মনকে প্রবোধ দিয়েছে, এবার সামনে রয়েছে প্রার্থিত স্থান। তাই হাঁফ ছাড়লেও ব্যস্ততার হাঁপানী তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলল।

কোলকাতার গাড়ি গোদাগাড়ি থেকে না আসা পর্যন্ত বিশাখার দম আটকে যাবার উপক্রম। গাড়িতে উঠে বিশাখা বলল, পদ্ম, খাবার কিছু আছে?

পদ্ম খাবার প্রস্তুত করতে বসল।

প্রথম শ্রেণীর কামরায় মাত্র দুটি প্রাণী। তৃতীয় ব্যক্তি কেউ নেই। গাড়ি চলতে সুরু করতেই পদ্ম খাবারের প্লেট এনে রাখল বিশাখার সামনে।

তোর খাবার কোথায়? ওকি ঘোমটা টেনেছিস কেন?

খাবার আছে। দেশে এসে গেছি। গাঁয়ের বউ, ঘোমটা না দিলে লোকে নিন্দে করবে যে।

বিশাখা হেসে বলল, তা বটে।

হাসির সাথে কান্নাও পেল তার। ঘোমটা টানা বউটি সেজে পদ্ম নিজের ঘরে প্রবেশ করবে, হয়ত নিতাই থাকবে না। নাইবা থাকল, অধিকারটা ছাড়বে কেন! বিশাখা পদ্মের মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, তোকে মানিয়েছে ভালো।

লজ্জা-রাঙা মুখখানা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, কি যে বল বিশাখাদিদি!

রাত দশটায় পুরাতন শহরের ফেরীঘাটে এসে দাঁড়াল বিশাখা আর পদ্ম। পেছনে মোট মাথায় নিয়ে চারজন কুলী। রামতিরিকে শুতে চলে গেছে। ঘাটে নিশুতি নেমে এসেছে অনেক আগেই। ফেরী বন্ধ হয়ে গেছে সূর্য ডোবার সাথে সাথে। ওপারের সুলতানী বুরুজটা দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে।

পদ্ম বলল, তাহলে আজ রাতে আমার ওখানে চল বিশাখাদিদি।

নদী পার হতে না পারলে তাই যেতে হবে। এই রামভরস্, দেখতো খোলা ডিঙ্গি আছে নাকি ওধারের বাঁকে। মাঝিকে ডেকে তুলে নিয়ে আয়। জেলে ডিঙ্গি থাকলেও ডাকবি।

হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি করে ডিঙ্গি জোগাড় হল। মালপত্তর নিয়ে সবাই উঠল ডিঙ্গিতে। ঘাটে এসে ডিঙ্গি ভিড়তেই বিশাখা লাফিয়ে পড়ল কিনারায়, কুলীরা মালপত্তর নিয়ে পদ্মের সাথে পিছু পিছু এসে দাঁড়াল শ্যামের মন্দিরের আঙ্গিনায়।

বিশাখাকে মন্দিরের আঙ্গিনায় না দেখে পদ্ম কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল। কুলীরা মাল নামিয়ে পয়সার তাগাদা দিতে লাগল।

পদ্ম ডাকল, বিশাখাদিদি।

মন্দিরের ওপাশ থেকে বিশাখা জবাব দিয়ে এগিয়ে এল।

কোথায় গিয়েছিলে?

ভেতর বাড়ির দরজাটা খুলছিলাম। দেখলাম খোলাই আছে। মালগুলো ভেতর বাড়িতে তুলে দাও রামভরস।

মালপত্র গুছিয়ে শোবার মত জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিতে নিতে রাত শেষ হয়ে এল। যখন বিছানায় গা এলিয়ে দিল তখন ভোরের মুরগী ডাকতে আরম্ভ করেছে।

সকাল বেলায় পূজা করতে এসে অন্দর বাড়ির দরজা খোলা দেখে রাধানাথ ধীরে ধীরে এল ভেতর বাড়ির উঠোনে। লোক চলাচলের চিহ্ন দেখে উঠে দাঁড়াল শোবার ঘরের বারান্দায়। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখে রাধানাথ চমকে উঠল। নিজের মনেই বলল, বিশাখা। বিশাখা এসেছে।

যেমন এসেছিল তেমনি ফিরে গেল রাধানাথ।

মন্দিরে পূজার বাজনা বেজে উঠল।

ঘুম ভেঙ্গে গেল বিশাখার। ডেকে তুলল পদ্মকে।

পদ্ম মন্দিরে যাবি নে?

যাব বলে, পদ্ম গামছা নিয়ে স্নানে বেরিয়ে গেল।

স্নান সেরে পদ্ম সবে মন্দিরের সিঁড়িতে পা দিয়েছে এমন সময় কাকে দেখে সে চমকে উঠল! —কে কে? ঘোমটা টেনে পদ্ম ফিরে এল ভেতর বাড়িতে।

উঠে দাঁড়িয়ে ডাকল, বিশাখাদিদি।

বিশাখা হাত মুখ ধুয়ে প্রস্তুত হচ্ছিল মন্দিরে যাবার জন্য। পদ্মের ডাক শুনে বাইরে এসে দাঁড়াল। আচমকা পদ্ম ছুটে এসে বিশাখাকে জাপটে ধরে কাঁপতে লাগল।

কি হয়েছে বল না।

মন্দিরের সিঁড়িতে।

কি?

কাকে যেন দেখলাম!

কাকে? কাকে? বিশাখা খুঁজে পেয়েছে উত্তর তবুও জিজ্ঞাসা করল, নিতাই?

তাইতো মনে হল।

তুই বস, আমি আসছি।

বিশাখা ত্বরিত পদে ছুটে গেল মন্দিরে। তখনও লোকটি বসে ছিল সিঁড়িতে। বিশাখা সিঁড়িদিয়ে উঠতে উঠতে তার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে?

আজ্ঞে আমি নিতাই ঘোষ।

নিতাই ঘোষ? কোথাকার নিতাই ঘোষ?

আজ্ঞে ওপারের।

তা এতদিন কোথায় ছিলে?

যুদ্ধে গিয়েছিলাম। ছাড়া পেয়ে আজ সাতদিন হল এসেছি। বাড়িঘর সব ভেঙ্গে গেছে তাই মন্দিরের ঠাকুরের হুকুমে এখানেই থাকি।

বিশাখা গম্ভীর ভাবে ডাকল, নিতাই।

আজ্ঞে।

আমার সাথে এস।

আজ্ঞে।

বিশাখার পেছন পেছন নিতাই এসে দাঁড়াল ভেতর বাড়িতে।

পদ্ম আশঙ্কা নিয়ে শোবার ঘরে তখনও কাঁপছে।

বিশাখা নিতাইকে নিয়ে সোজা শোবার ঘরে এস বলল, একে চেন?

নিতাই স্তম্ভিতভাবে চেয়ে রইল পদ্মের দিকে। অস্ফুট স্বরে বলল, পদ্ম।

ঘোমটার আড়ালে পদ্ম ফুঁপিয়ে উঠছে।

বিশাখা হুকুমের সুরে বলল, নে পদ্ম এবার বোঝা পড়া করে নে।

বিশাখা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

রাধানাথ বিগ্রহকে ভোগ দিতে বসেছে। পেছনে এসে দাঁড়াল বিশাখা।

ভোগ শেষ করে উঠে দাঁড়াতেই বিশাখার সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল।

বিশাখা জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছেন মাষ্টার মশায়?

ভাল।

বিশাখা আর প্রশ্ন করতে পারল না।

রাধানাথ প্রশ্ন করল, আর তুমি?

দেখতেই পাচ্ছেন।

আসবার আগে একটা খবরতো দিতে হয়।

সময় ছিল না। আসবার ঠিক ছিল না, হঠাৎ যখন ছুটি পেলাম তখন খবর দেবার চেয়ে খবর সৃষ্টি করবার দিকে ঝোঁক পড়ল বেশী, তাই ছুটতে ছুটতে আসতে হয়েছে।

পিসিমার কথা তোমাকে তো লিখেছিলাম।

হাঁ। সে চিঠি পেয়েছি।

আশা করেছিলাম, সেই সময় তুমি আসবে।

বিশাখা দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে বলল, মরণের আহ্বানে মানুষ ছুটে আসবে, এতে নতুনত্ব না থাকলেও অভিনবত্ব রয়েছে। সেটাই কি আশা করেন।

প্রিয়জনের মৃত্যুতে কেউ আসবে এটা কি আশা করা উচিত নয়।

প্রিয়জন! তা বটে।

বিশাখা মন্দির থেকে নেমে এসে উঠোনে দাঁড়াল।

নিতাইও এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে পদ্মকে নিয়ে।

নিতাই বলল, পণ্ডিত মশায়, এবার বাড়ি যাচ্ছি।

রাধানাথ কোন কথা বলবার আগে বিশাখা হেসে বলল, বাড়িটা শক্ত করে ধরে রেখ নিতাই। নইলে পস্তাতে হবে। মাটির দেওয়ালে বৃষ্টির জল না লাগে যেন।

তা আর কেন বলেন দিদিমণি। জানেন তো জাত গয়লা, বুদ্ধিটা আশী না হলে পোক্ত হয় না।

পদ্ম এসে প্রণাম করলো।

এত তাড়াতাড়ি কেন? খেয়ে দেয়ে যাবি।

তাড়াতাড়ি যে কেন তা বিশাখা ভালোভাবেই বোঝে। হারাণো সম্পদ আঁচলে বেঁধে পদ্ম এখন রাজরাণী, তার সাম্রাজ্যে ফিরে যেতে চায়।

ওবেলা আসব বিশাখাদিদি। মিনতির সুরে পদ্ম নিবেদন জানালো।

বিশাখা অন্যমনস্ক ভাবে বলল, বেশ তাই আসিস।

ইতিমধ্যে রাধানাথ যে চলে গেছে তা কেউ লক্ষ্য করেনি। নিতাই আর পদ্ম চলে যেতেই বিশাখা ফিরে তাকিয়ে দেখে রাধানাথ নেই।

রাধানাথকে বুঝবার মত ক্ষমতা বিশাখার যথেষ্ট হয়েছে এতদিন সে নিঃসঙ্গ বোধ করেনি। আজ পদ্ম ফিরে যেতেই মনে হল, সে সম্পূর্ণ একা, তার অতীত ছিলনা, বর্ত্তমান নেই, ভবিষ্যতও নেই।

অমিতা ঘর পেয়ে চলে গেছে। পদ্মও ঘর পেয়ে চলে গেল। আর সে নিজে দাঁড়িয়ে রয়েছে মরু প্রান্তরে, ধূ ধূ করছে বালুকারাশি, জলের সন্ধান কোথাও নেই তৃষ্ণা মেটাবার। অথচ, যাক সে কথা।

সময় দাঁড়ায় না। চলতে থাকে। পেছনে তাকায় না সময়। বিশাখার সময় কাটে। দিন কাটে রাত কাটে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটে। ছুটির দিন ফুরিয়ে আসে, রাধানাথ পূজায় বসে, আরতি করে, ভোগ দেয়, মন্দির থেকে সোজা ফিরে যায় নিজের বাড়িতে। বিশাখা ইচ্ছা করেই তার সাথে দেখা করে না।

আবার বর্ষা নেমেছে। সন্ধ্যা থেকেই টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। বিশাখা

শোবার ঘরের বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে দেখছিল বৃষ্টির খেলা। এমন সময় ছাতা মাথায় দিয়ে রাধানাথ এসে দাঁড়াল তার সামনে কয়েকখানা ছেঁড়া খাতা নিয়ে।

রাধানাথ বলল, শুনলাম তুমি নাকি শিগ্‌গীরই চলে যাচ্চ?

বিশাখা বলল, ছুটি ফুরিয়েছে তাই যেতে না চাইলেও যেতে হবে।

আমি এসেছি ক বছরের হিসাব বুঝিয়ে দিতে। তুমি এখানে থাক না, এ সব দায় দায়িত্ব পালন করা আমার পক্ষে অসম্ভব জেনেও কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম এবার হিসাব পত্তরটা দেখেশুনে বুঝেসুঝে নাও।

অবাক হয়ে বিশাখা রাধানাথের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, হিসাব!

হাঁ। আদায়-তশীলের ভার দিয়েছি একজনকে, পূজোর দায়িত্ব দিয়েছি চক্কোত্তিদের রামলোচনকে, আমি শুধু দেখা শোনা করব। এত বড় দায়িত্ব থেকে বিশ্রাম নিতে চাই। তাই হিসাব বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।

হিসাব। আপন মনেই বিশাখা কথাটা বলে চুপ করে বসে রইল। হিসাব দেখবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ তার দেখা গেল না। রাধানাথ যেন বাধ্য হয়েই খাতাপত্তর খুলে বসল।

বিশাখা চেঁচিয়ে উঠল, বলল, মাস্টার মশায়, আপনি নানাভাবে আমাকে অপমানিত করেছেন, এতেও কি আপনি খুশী হননি। আর কেন?

কি বলছ বিশাখা।

কি বলছি? —বুঝবার মত মন আপনার তৈরী হয়নি। আপনি যান, আপনি যান। হিসাব দেবার ক্ষমতা আপনার নেই। আপনি পূজারী, মাটির পুতুলের, কাঠের, পাথরের, আপনি হিসাব কি বুঝবেন। আপনি যান, আপনি যান, আপনি যান। বলতে বলতে বিশাখা শোবার ঘরে এসে বিছানায় মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠল।

রাধানাথ অপরাধীর মতো ধীরে ধীরে নেমে গেল বারান্দা থেকে।

রাধানাথ ফিরে এল নিজের পর্ণকুটীরে, আরসীতে মুখ দেখলে বুঝতে পারত কয়েক মুহূর্ত পূর্বের রাধানাথ আর নেই। সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাধানাথের কঙ্কাল। যোগনাথের বংশধর, ন্যায়বিশারদের বংশধর অমৃতময়ীর বংশধর, মানুষের হৃদয়ের সন্ধান করতে পারেনি। চিন্তা করেছে, বিশাখা আর তার

মাঝে ব্যবধানের প্রাচীর কত উচ্চ। এর পরও যে আরও একটা জীবন রয়েছে সে জীবনের সন্ধান পেয়েও পথ খুঁজে পায়নি।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ছে বাহিরে। রাধানাথ মাদুর পেতে গা এলিয়ে দিয়ে ভাবছিল পরিণাম। ভাবনার গতি পথে এসে স্বশরীরে হাজির হল বিশাখা। বৃষ্টির জলে সর্ব্বাঙ্গ শিক্ত। এলোচুল বেয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে। দরজা ঠেলে ভেতরে এসেই বিশাখা বিনা ভূমিকায় প্রশ্ন করল, হিসাব নিতে এসেছি মাষ্টার মশায়।

রাধানাথ ধড়মড় করে উঠে বসে বলল, কিসের হিসাব।

আমার। আমার দৈনন্দিন হিসাব। সারাজীবনের হিসাব জানতে এসেছি আপনাদের পাঁজি পুঁথির সাথে মানুষের জীবনের কতটা সম্পর্ক। আপনার নিজস্ব ভাবধারার সাথে সমাজ ব্যবস্থার কতটা যোগাযোগ।

বিস্মিতভাবে রাধানাথ বলল, কি বলছ বিশাখা।

বলা আমার অনেক আগেই শেষ হয়েছে। আজ শুধু না বলার হিসাব নিতে এসেছি। আমার হিসাব বুঝিয়ে দিন।

রাধানাথ ক্ষণকাল মৌনতা অবলম্বন করে রইল। ডাকল, বিশাখা।

বলুন।

তুমি যথেষ্ট লেখাপড়া শিখেছ। তা বাদেও বহুদিনের আচার বিচারের গণ্ডী ভেঙ্গে তুমি ছুটে বেরিয়েছ। তোমাকে শেখাবার মতো ধৃষ্টতা আমার নেই। আমার কাছে যা স্পষ্ট, তোমার কাছেও তা স্পষ্ট। অথচ জেনে শুনেও আমি স্পষ্টকে যখন গ্রহন করতে পারছি না তখন অবশ্যই কোথাও কোন অসুবিধা আছে।

আছে সংস্কার।

তা তুমি অস্বীকার কর ?

করি না, মানুষ অতীতকে যতই অস্বীকার করুক অতীত তাকে ভবিষ্যতের দিকে টেনে নিয়ে চলে অজ্ঞাতে। কিন্তু সেইতো জীবনের শেষ নয়, এই সংস্কারতো মানুষকে বাঁচবার পথ দেখাবে না। যেখানে এই জীবনের পরিণতি মৃত্যুতে, যেখানে মানুষ মানুষেই শেষ, সেখানে সংস্কার হৃদয়কে সঙ্কুচিত করে, অগ্রগমনের পথ রোধ করে।

আমি পশ্চাতে থাকতে চাই, অগ্রগমনকে ভয় করি।

যুক্তি দিয়ে আপনাকে বোঝাতে পারব না, কেননা আপনি নিজের যুক্তির বাইরে কখনও আসবেন না। শুধু একবার ভেবে দেখুন, আমি জীবনে কি পেয়েছি। আমাকে যা দেবার ছিল তা কেউ দেয়নি, দিয়েছে বঞ্চনা আর বঞ্চনাকে কায়েম করতে স্তোক।

রাধানাথ উত্তর দিল না।

বিশাখা কিছুক্ষণ থেমে থেকে আবার বলল, অপরকে বঞ্চিত করে যারা সঞ্চয় করতে চায় তাদের হিসাবের খাতায় জমার অঙ্ক কখনই থাকতে পারে না, থাকবেও না।

বিশাখা এগিয়ে গেল দরজার কাছে। মুখ ঘুরিয়ে বলল, যে দিন হিসাব-নিকাশ শেষ হবে সেদিনের প্রতিক্ষা হয়ত করব না, কিন্তু সেদিন খরচের ঘরে কৈফিয়ত লিখতে ভুলবেন না।

বিশাখা যেমন ভিজতে ভিজতে এসেছিল তেমনি বেরিয়ে গেল। রাধানাথের মনের উপর দিয়ে যে প্রবল ঝটিকা প্রবাহ বয়ে গেল তার হদিস কেউ পেল না।

শেষ রাত থেকেই বিশাখা প্রস্তুত হয়ে নিল। জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে সংবাদ পাঠাল রাধানাথের কাছে। নটার ট্রেনে কাটিহার হয়ে চলে যাবে তার কর্মস্থলে। ওপারে পদ্মকে সংবাদ পাঠাল, যদি সম্ভব হয় তাহলে নিতাই যেন কাটিহারে গিয়ে তাকে আমিনগাঁর গাড়িতে তুলে দিয়ে আসে।

সংবাদ পেয়ে নিতাই এসে হাজির।

রাধানাথ তখনও আসেনি।

তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে বিশাখা আগেই মুনীষদের মাথায় মালপত্তর দিয়ে নদীর ঘাটে পাঠিয়ে দিল।

নিতাই খেয়ে উঠে মন্দিরে গেল শ্যামসুন্দরকে প্রণাম করতে।

রাধানাথ এসে দাঁড়াল উঠোনে।

শোবার ঘরের দরজায় কুলুপ দিতে দিতে বিশাখা বলল, আমি যাচ্ছি।

রাধানাথ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

জীবনের হিসাব মিটিয়ে দিয়েছি মাস্টার মশায়। আমার হিসাব শেষ, আপনার হিসাব যেদিন শেষ হবে সেদিন খবর দেবেন।

রাধানাথ মৃদুস্বরে বলল, না গেলে কি হত না।

বিশাখা হেসে বলল, গুরু শাপাৎ। পিতার দান। এই হল বিধিলিপি। গৌড়ের মাটিতে যত বেশি উত্থান পতন ঘটেছে, তার তুলনায় এ যাওয়াটা অতি অকিঞ্চিৎকর। গৌড়ের মেয়ে হারেমের বন্ধন ভেঙে উন্মুক্ত আকাশের তলায় দাঁড়াতে পেরেছে, এইটাই যথেষ্ট।

বিশাখা রাধানাথকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কোন দিন পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করিনি আপনাকে, যেদিন বুঝেছি দেবতা আমার নয়, সেদিন থেকে শ্যামসুন্দরকেও প্রণাম করিনি, আজ আপনাকে প্রণাম করলাম। কেন করলাম, আপনার অহমিকার কাছে আমার অভিমান মূল্যহীন, তাই অহমিকাকে প্রণাম জানালাম, ভক্তিতে নয়, ক্ষোভে।

রাধানাথের ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল, কোন কথা বলতে পারল না। যোগনাথের বংশধর বোধহয় যোগনাথের মতোই অসংশোধনীয় ভুল করে বসল। কম্পিত অধরোষ্ঠে সান্ত্বনার দুটো কথা যদি শোনা যেত তা হলে ভুলের সমাপ্তি ঘটত।

বিশাখা নিতাইকে ডেকে বলল, চলো নিতাই। ট্রেনের টাইম হয়ে এল।

বিশাখা দু এক পা এগিয়ে যেতেই রাধানাথ ডাকল, বিশাখা।

আর ডাকবেন না—স্থিরতা ধ্বসে পড়বে বাস্তবের এবং কল্পনার।

আমাকে ক্ষমা করো।

বিশাখা আর্তনাদ করে উঠল, বলল, এতো অক্ষমের আর্তনাদ, মানুষের পৌরুষ নয়। ক্ষমা মানুষের জীবনে ব্যঙ্গ। সব সহ্য করতে পারি, ব্যঙ্গ সহ্য করতে পারি না।

বিশাখা উঠোন পেরিয়ে ঘাটের কিনারায় এসে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে উঠে বসল ডিঙিতে। পাথরে খোদাই মূর্তির মতো মন্দিরের উঠোনে দাঁড়িয়ে রইল রাধানাথ।

বিশাখা নিতাইকে তাড়া দিয়ে বলল, ডিঙি খুলে দাও নিতাই। গাড়ি ফেল না করি।
